অনুসন্ধান

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতি প্রকাশন
২২এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ মাঘ ১৩৬৬

প্রকাশক
শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়
বিভূতি প্রকাশন
২২এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

মুদ্রক
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীরণেনঅয়ন দত্ত

সহায়তা করেছেন
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত

ব্লক ও মুদ্রণ
কলার স্টুডিও এবং ফাইন প্রিণ্টার্স
৪২, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা-৬

বাঁধিয়েছেন
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওআর্কস
৬১।১, সূর্য সেন স্ট্রীট কলিকাতা-১২

দাম তিন টাকা

ভূমিকা

স্বর্গত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বহু উপন্যাস ও ছোট গল্পের রচয়িতা। কিন্তু তিনি একমাত্র 'অনুসন্ধান' ছাড়া 'নভেলেট' বা এই জাতীয় ক্ষুদ্র উপন্যাস রচনা করেন নাই। 'অনুসন্ধান'কে আপাত দৃষ্টিতে বড় গল্প বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ইহা গল্প নহে, ইহা একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ উপন্যাস। উপন্যাসের বিস্তৃতি ও রস ইহাতে রহিয়াছে। 'অনুসন্ধান' চলচ্চিত্রের কাহিনী হিসাবে রচিত হইয়াছিল এবং ১৩৫৪ সালের শারদীয়া 'সোনার বাংলা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থকারের 'অনুসন্ধান'কে বর্ধিতায়তন করিবার ইচ্ছা ছিল। এই কারণে গ্রন্থটি এযাবৎ পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। গ্রন্থকারের মৃত্যুতে তাহা সম্ভব হয় নাই। 'অনুসন্ধান' 'সোনার বাংলা'য় যেভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল এখানেও সেভাবেই মুদ্রিত করা হইল।

'অনুসন্ধানে'র সঙ্গে তিনটি গল্প মুদ্রিত হইল। ইহার মধ্যে 'সান্ত্বনা' নামক গল্পটির একটি ইতিহাস রহিয়াছে। ১৯৪৯ খৃস্টাব্দে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর ষষ্ঠিতম জন্মদিবস উপলক্ষে তাঁহাকে 'নেহরু অভিনন্দন গ্রন্থ' দ্বারা সম্বর্ধনা করা হয়। এই উপলক্ষে বিভূতিভূষণের 'সান্ত্বনা' নামক গল্পটি লিখিত হয় এবং ইংরেজি ও হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত 'নেহরু অভিনন্দন গ্রন্থে' মুদ্রিত হয়। 'নেহরু অভিনন্দন গ্রন্থে'র প্রকাশকগণ কিছুকাল গল্পটির মূল ভাষায় প্রকাশে বিরত থাকিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মূল পাণ্ডুলিপিটি গ্রন্থাকারের

জীবিতকালেই নষ্ট হয় এবং তিনি আর পুনরায় উহা লিখিবার চেষ্টা করেন নাই। গ্রন্থকারের মৃত্যুর বহুদিন পরে ১৩৬৫ সালের শারদীয়া 'কথাসাহিত্যে' ইংরেজি গল্পটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদক আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান দেবীদাস চট্টোপাধ্যায়। 'অনুসন্ধান' প্রকাশের ব্যাপারে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত বহুভাবে আমাদের সহায়তা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া গ্রন্থাদি দিয়া সহায়তা করিয়াছেন শ্রীমতী মণিকা মুখোপাধ্যায়, শ্রীযূথিকাদেবী ও শ্রীসুপ্রিয় সরকার। তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাই।

'আরণ্যক' স্টেশন রোড,
ব্যারাকপুর
শ্রীপঞ্চমী ১৩৬৬

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুসন্ধান

আমাদের প্রকাশিত

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কয়েকটি বই

অশনি-সংকেত

ছায়াছবি

ঊর্মিমুখর

নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব

অনুসন্ধান

নারাণ মাস্টার সকালে উঠে স্ত্রীকে চা দিতে বললেন। স্ত্রী মনোরমা বললেন,—চাও নেই, চিনিও নেই। দুধ তো দিয়ে যায় নি গোয়ালা। দু-মাস তাকে টাকা দেওয়া হয় নি। তুমি সংসারের কিছুই দেখ না। আমি কি করে একা সংসার চালাই ?

বাইরে থেকে ছেলেরা বললে,—বাড়ি আছেন স্যার ? নারাণ মাস্টার হন্তদন্ত হয়ে স্ত্রীকে বলেন, একটু চা করে দাও যা হয় করে। ওরা সব এসে গেল।

মনোরমা মুখ ঝামটা দিয়ে বলেন, এলে কি হবে ? শুধু ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। তোমার হয়েছে তাই। কারো কাছে পিত্যেস নেই, ওদের পেছনে ভূতের মত খাটুনি। এর চেয়ে টুইশানি ধরলে তো কাজ হয়, দু-পয়সা আসে।

বাইরে একখানা চালাঘরে গ্রামের চাষাভুষোদের অনেকগুলো ছেলে জুটেছে। নারাণ মাস্টার তাদের কাউকে অক্ষর পরিচয় করান, কাউকে ভাঙা একটা গ্লোবে ভূগোল

শেখান, একজনকে কবিতা পড়তে শেখান। একটি গরীব ছেলেকে বলেন,—কি খেয়ে এসেচিস্ সকালে? কিছু না? শোন্, তোর কাকীমার কাছে গিয়ে বল দুটি মুড়ি দিতে। আমি বলে দিয়েচি যেন বলিস্ নে?

ছেলেটি ইতস্ততঃ করে। সে তার কাকীমাকে চেনে। সেখানে যেতে তার সাহসে কুলোয় না, তবু নারাণ মাস্টারের মনস্তুষ্টি করবার জন্যে পায়ে পায়ে অন্দরের দিকে এগোয়। মনোরমা বসে ধান সিদ্ধ করচেন রান্নাঘরে। ছেলেটি ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। ডাকতে সাহস হয় না। মনোরমা হঠাৎ এগিয়ে বলেন,—কে? বিষ্টু? কি রে?

—এই—এই—

—কি?

—মাস্টার মশায় বলে দিলেন, এই—মোরে দুটি মুড়ি দিতি!

—তা আর বলে দেবেন না কেন? তাঁর কি? কোথা থেকে কি জোটে তাঁর সেদিকে কতটুকু খেয়াল থাকে? যা মুড়ি নেই। বল্ গে যা—

নারাণ মাস্টার খেতে বসেচেন। বাড়ির পাশের এক গরীব গেরস্ত বাড়ির ছোটো ছেলে ওৎ পেতে থাকে, কখন তিনি

খেতে বসবেন। যদি না আসে, নারাণ মাস্টার ডাকেন,—আয় বিলু, আয়—

বিলু বলে—কি? হ্যাঁ?

সে ওই দুটো কথা বলতে শিখেচে।

হেঁটে স্কুলে যেতে হয় অনেকদূর। দেরি হয়ে যায়, পথে যেতে যেতে শোনেন স্কুলের ঘণ্টা বাজচে। সাত মিনিট লেট্। হেড মাস্টার নীরদ রায় বড় কড়া লোক, বয়স পঞ্চাশের ওপর, চোখে চশমা, লম্বা দোহারা চেহারা।

—এত দেরি হোলে রোজ রোজ চলবে না, নারাণবাবু—

নারাণবাবু অপ্রতিভ মুখে হাজিরা খাতাখানা টেনে নেন। কিন্তু আরও পাঁচ মিনিট পরে হেড মাস্টারের প্রিয়পাত্র সারদাবাবু এসে একগাল হেসে বলেন,—উঃ কি রোদ আজকে স্যার। গা যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে।

হেড মাস্টার বলেন,—আপনার মেয়ের বিয়ের ঠিক হোল হুগলীতেই? বসুন, বসুন—

—দুটো পান নিন স্যার।

একটি ছেলে ক্লাসের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। নাম

ইন্দুভূষণ.। সুন্দর চেহারা। নারাণবাবুকে এগিয়ে এসে ক্লাসে নিয়ে যায়। ক্লাসে ছেলেদের ভিড়। নারাণবাবুকে সবাই ভালবাসে। পছন্দ করে, ভয়ও করে। ক্লাস চুপ হয়ে যায়—একবার মৃদু ভর্ৎসনায়। অঙ্ক কষান, বোর্ডে খড়ি দিয়ে।

ইন্দুভূষণ বলে—অঙ্ক কষার পরে সেই গল্পটা বলুন স্যার।

সব ছেলে সায় দেয়। নারাণবাবু বলেন, জানলাগুলো খুলে দাও, দেখো তো কেমন সুন্দর। মাঠ, গাছপালা ভগবানের তৈরি সুন্দর পৃথিবীকে চোখ ভরে দেখতে শেখো। শুধু বইয়ের পড়া পড়লে মানুষ হবে না। চোখের দৃষ্টি ফুটুক।

ইন্দুভূষণ বলে—ঐ দেখুন বাঁশঝাড়ের আকাশটা কেমন ময়ূর-কণ্ঠি রং। নদীর ওপারে কি রকম কাশফুল ফুটেচে!

নারাণবাবুর মন আনন্দে ভরে ওঠে। এই একটি ছেলেকে তিনি অন্ততঃ দৃষ্টিদান করতে পারবেন হয় তো। ইন্দুভূষণ স্কুল ম্যাগাজিনের জন্যে লেখা—নিজের রচনা পড়ে শোনাচ্ছে, এমন সময়ে হেড মাস্টার দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে কড়া নজরে এক চমক ক্লাস রুমের দিকে চাইলেন। ইন্দুভূষণের পড়া বন্ধ হয়ে গেল। নারাণবাবু থতমত খেয়ে গেলেন।

পাশে অন্য একটি ক্লাস। হেড মাস্টারের প্রিয়পাত্র সারদাবাবু চেয়ারে বসে ঢুলছিলেন।

মনোরমা স্বামীর জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন অপেক্ষা করে। ও বেলা সত্যিই কিছু ছিল না খেতে দেবার। ভর্ৎসনা সুরে কথা বলেচেন। দুপুরে সেই দুঃখ মনে বড় বেজেচে। একটু চা দিতেও পারেন নি।

নারাণ মাস্টার বলেন,—অত হাসি হাসি মুখ কেন? কি খেতে দিচ্ছ।

মনোরমা বলেন,—হাত পা ধুয়ে নাও, এসো। স্বামীকে জল এগিয়ে দেন। পাখার বাতাস করেন।

নারাণবাবু জিগ্যেস করেন—ননী আজ ইস্কুলে যায় নি কেন?

মনোরমা মিথ্যে করে বলেন—পেটের অসুখ হয়েছিল। কিন্তু তা নয়, ননীমাধব অত্যন্ত অবাধ্য প্রকৃতির ছেলে, এ বয়সে অনেক রকম ছল চাতুরি শিখেচে। ভাদ্র মাসে বিলে জল বেড়েচে। সেখানে মাছ ধরতে গিয়েচে, পাড়ার দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে।

স্বামীর জলখাবার ও চা দেন মনোরমা। তালের বড়া আর

চা। গরম গরম বড়া ভাজেন, আর ভালো ভালো দেখে স্বামীর পাতে তুলে দেন।

বাইরে ছেলেরা এসে ডাকে—বাড়ি আছেন স্যার ? নারাণবাবু ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

মনোরমা বলেন—বোসো বোসো। অত খাটলে শরীর থাকবে কেন ? একটু বোসো। আর দু-খানা ভেজে দিই।

সেই ছোট ছেলেটি এসে টলতে টলতে নারাণবাবুর পাশে বসে যায়। ওর মুখে তুলে দিয়ে খাওয়ান।

নদীতীরে প্রতিদিন একটু করে বেড়াবার অভ্যেস আছে নারাণ মাস্টারের। ইন্দুভূষণ ও আরো দুটি ছেলেকে নিয়ে নক্ষত্র সংস্থান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্চেন আজ।

ইন্দুভূষণ বলচে, ভেনাস কোন্‌টা স্যার ?

নারাণ মাস্টার বলচেন—ওই বাঁশঝাড়ের মাথার ওপরে—ঐ দেখো।

—বেশ বড় নক্ষত্র—

—ওটিকে নক্ষত্র বলো না। ওটি গ্রহ। সৌর জগতের

একটা গ্রহ। অন্য অন্য গ্রহগুলির নাম করো তো? তোরা দেখেচিস্ শুক্র গ্রহ?

—ঐ বাঁশ ঝাড়ের মাথায়?

হঠাৎ সেদিকে দেখা গেল ননীমাধব জলের ধারে ছিপ নিয়ে মাছ ধরচে। বাপকে দেখে ননীমাধব ততক্ষণ ছিপ গুটিয়ে ফেলে। নারাণ মাস্টার দুঃখিত হন। বলেন—তুই তো আজ ইস্কুলেও যাস নি—অথচ তোর দিদির বাড়ি গিয়েচিস্ শুনলাম বাড়িতে।

ননী চুপ করে রইল। নারাণ মাস্টারের মেয়ের বিয়ে হয়েচে পাশের গ্রামেই।

—তোর মার কাছে বলে এসেচিস্ দিদির বাড়ি যাচ্চি?

—হ্যাঁ।

—কেন মিথ্যে কথা বলতে গেলি? অমন আর কখনো বলবে না। মিথ্যে কথা কারো কাছে কখনো বলবে না। সত্য কথা বলবে, এতে যদি কোনো ক্ষতিও হয়, তাও ভালো। সর্বদা মনে রাখবে এটি। কেমন তো? আচ্ছা বাড়ি যাও।

বাড়িতে মনোরমা সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখিয়ে প্রণাম করলেন।

পাশের বাড়ির গাঙ্গুলি-বৌ ও শুভদা ঠাকরুনের কাছে সংসারের দুঃখকষ্টের কথা বলেন। শুভদা এসেচেন তেল ধার নিতে। গরীব বিধবা। মনোরমা যেটুকু তেল আছে, তার বেশি অংশটা শুভদাকে ঢেলে দিলেন। স্বামীর কথা বলেন ওঁদের কাছে।

এমন লোক যদি দেখে থাকি কখনো পিসি। সংসারের দকে নজর নেই; কোনো দিকে নজর নেই। কি নিয়ে যে লোকটা থাকে দিনরাত! মেয়েটার ওই কষ্ট, তখুনি বলেছিলাম দোরের কাছে কুটুম্ব করতে নেই। দু-বেলা কথা শুনতে হবে, তখন তা শুনলেন না। এখন তাই হচ্ছে, যা বলেছিলাম।

শুভদা ঠাকরুন বললেন—শাশুড়ী খারাপ না হয় বুঝলাম। কিন্তু জামাই তো শুনেচি বড় ভালো ছেলে?

—ভালো হোলে কি হবে পিসি, মায়ের কাছে জুজু। মার সামনে কথা বলতে পারে ছেলে? উনি বলেন, মায়ের বাধ্য হয়েই থাকা ছেলের উচিত। বললাম যে, কোনোদিকে নজর নেই ওঁর—চাল নেই, তেল নেই, আজ বাদে কাল সকালে কি হবে ঠিক নেই—কে শুনচে সে সব কথা। ছাত্রদের নিয়েই ব্যস্ত। কেউ এক পয়সা দেবে না, ভূতের ব্যাগার খেটেই খুসি। আচ্ছা, বলো তো পিসি, এ কি রকম কাণ্ড?

নারাণ মাস্টার বাইরে থেকে হাঁক দেন এই সময়ে—একটা আলো ধরো। বাইরের দিকে বড্ড অন্ধকার।

মনোরমা মুখ ঝামটা দিয়ে বলেন—হ্যাঁ, সাতটা লণ্ঠনে আলো জ্বেলে তোমার জন্য বসে আছি যে! পিপে পিপে তেলের ব্যবস্থা ঘরে রেখেচ যে! এলে কোত্থেকে আমার মাথা কিনে, জিগ্যেস করি?

নারাণ মাস্টার লজ্জিত মুখে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে হোঁচট খান। মনোরমা বলেন—লাগলো নাকি? তোমার দেহটা এমনি করেই সাতখোয়ারে যাবে। দেখি কোথায় লাগলো?···

মনোরমা রান্নাঘরে গিয়ে চা তৈরি করচেন। ননীমাধব খিড়কী দোর দিয়ে চুপি চুপি ঢুকে বললে, মা, বাবা কোথায়?···বাটিতে কি?

—ওঁর জন্যে দুটো চিঁড়ে ভাজা করেচি ঘি দিয়ে। না খেয়ে খেটে খেটে ওঁর শরীরটা যে গেল! এই খানিক আগে এমন হোঁচট খেলেন যে পা ভেঙে যেতে যেতে রয়ে গেল। ও থেকে তোমাকে না। তোমার জন্যে চালভাজা আছে—তেল মেখে দিচ্ছি। দিদির বাড়ি যাস নি?

—হুঁ।

—কেমন আছে সে? এতক্ষণ সেখানে ছিলি? কি খেতে দিলে?

—কিছুই না। ঘণ্টাকর্ণ। দাও চিঁড়েভাজা—দিদি ভাল আছে।

—না—না। এ ওঁর জন্যে ঘি দিয়ে ভাজা। তোকে এর পরে দেবো এখন। বোসো গে যাও।

নারাণ মাস্টার চিঁড়ে ভাজা খেতে খেতে স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করেন।

মনোরমা বলেন—ননী এই এল অমলার শ্বশুর বাড়ি থেকে। অনেকক্ষণ ছিল সেখানে। অমলা ভাল আছে।

নারাণ মাস্টার স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন—কে বললে এ সব কথা?

—কেন ননী বললে, আবার কে বলবে। সে এই তো এল ওর দিদির বাড়ি থেকে। রান্নাঘরে বসে খাবার খাচ্ছে।

নারাণ মাস্টার একবার ভাবলেন স্ত্রীকে ছেলের গুণের কথা সব খুলে বলেন। তাঁর উপদেশ সত্ত্বেও সে আবার তার মায়ের কাছে মিথ্যে কথা বলেচে। কিন্তু সরলা পত্নীর মুখের দিকে চেয়ে নারাণ মাস্টার কথা চেপে গেলেন।

বাইরে থেকে ছেলেরা ডাক দিলে—বাড়ি আছেন স্যার? ছেলেরা পড়তে এসেচে। ব্যস্ত হয়ে ওঠেন নারাণ মাস্টার।

নারাণ মাস্টার স্কুলে গেলেন। হেড মাস্টার আজ আর কিছু বলেন না। ক্লাসে ক্লাসে ছেলেরা তাঁকে নিজের নিজের ক্লাসে পাবার জন্যে যথেষ্ট আগ্রহ দেখায়। ইন্দুভূষণের ক্লাশে নারাণ মাস্টার ঢোকেন। একটু পরে হেড মাস্টার এসে গম্ভীর ভাবে ক্লাসের বাইরে দাঁড়িয়ে জানিয়ে গেলেন, এ ক্লাসটা তাঁর নয়। রুটিনটা দেখে ঢুকলেই তো হয়।

অঙ্ক কষাতে কষাতে কি করে এসে পড়ে সূর্যের কথা। সূর্য আছে বলে, জগতে রঙের খেলা অদ্ভুত—নারাণ মাস্টার বোঝান। তা থেকে নিউটনের কথা এসে পড়লো—জ্ঞান তপস্বী নিউটন।

বাইরে দাঁড়িয়ে হেড মাস্টার শোনেন। নারাণ মাস্টারের জনপ্রিয়তা হেড মাস্টারের চক্ষুশূল।

একটু পরে মাখনলাল সুর স্কুলে এসে ক্লাসে ক্লাসে বেড়াতে বেরুলেন। মাখনলাল সুর দু-তিনটি তেলের কলের মালিক। কালো, মোটাসোটা চেহারা, মুখখানাতে দাম্ভিকতা মাখানো। লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানেন না, টাকার জোরে স্কুলের সেক্রেটারি হয়েছেন বলে শিক্ষকদের ওপর প্রভুত্ব একটু বেশি করেই খাটান।

বিভিন্ন ক্লাসে ঢুকে পরীক্ষা করেন। প্রথমে ক্ষেত্রবাবুর ক্লাস। ক্ষেত্রবাবু সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ান। বলেন, পড়িয়ে যান—আমি শুনি। বাংলা সাহিত্য পড়াচ্ছেন ক্ষেত্রবাবু। স্যুরমশায় বলেন, ও সব কি আর কবিতা? কবিতা ছিল সেকালে যত্নু মুখুয্যের। কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ উষ্ট্র সারি সারি, কি আশ্চর্য্য শোভাময় যাই বলিহারি ইত্যাদি। কৌটো খুলে পান খান ক্লাসের মধ্যেই।

তারপরে যত্নুবাবুর ক্লাস। ইতিহাস পড়াচ্ছেন যত্নুবাবু, মন দিয়ে শিবাজির জীবনী বর্ণনা করচেন ছেলেদের কাছে। মাখন স্যুর এক অবান্তর প্রশ্ন করে বসলেন—বলো দিকি, দাশুরায় পাঁচালি লিখেছিলেন কত সালে? মাস্টার বলে দাও না ওদের। দাশুরায়—আহা, অমন গান আর কেউ বাঁধতে পারবে না—

তারপরে নারাণবাবুর ক্লাস। নারাণবাবু মশগুল হয়ে গিয়েচেন অধ্যাপনায়; কিন্তু তিনি অঙ্ক ছেড়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করচেন ক্লাসে। মাখন স্যুর ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনি না অঙ্কের মাস্টার? আমি শুনেচি আপনি ক্লাসের পড়া না করিয়ে ছেলেদের কাছে বাজে গল্প করেন।

নারাণবাবু বললেন,—কথাটা উঠলো কিনা, আবৃত্তি সর্ব-

শাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী, বিশেষতঃ কবিতার। তাই আবৃত্তির নিয়মটা ওদের—

—তা শেখাবার কোনো দরকার নেই। আপনি যে জন্যে আছেন, তাই করুন। আমি অনেকদিন থেকে এরকম শুনে আসচি, কিন্তু আজ স্বচক্ষে দেখলাম।

একটু পরে চাকরে এসে একটা শ্লিপ দিয়ে গেল। নারাণবাবুর তলব হয়েচে হেড মাস্টারের ঘরে।

নারাণবাবু পায়ে পায়ে সেখানে গিয়ে দেখেন হেড মাস্টার অপ্রসন্ন ও বিরক্ত মুখে বসে। বললেন—আপনি কোনো কাজ করেন না ক্লাসে—ছেলেদের যা পড়ান তা সিলেবাসের বাইরে। সেকেণ্ড ক্লাসে এ্যালজেব্রা কতদূর করিয়েছেন দেখি এ বছর। মোটে সিম্পল ইকোয়েশন ধরাচ্ছেন? তা' হোলে কবে কোর্স শেষ করবেন আপনি? আপনাকে নিয়ে বড় মুশকিল হোল দেখচি। আপনার পুরোনো রোগ গেল না। সেই বাজে গল্প করা।

নারাণবাবু বললেন—আমি বাজে গল্প করি নে—ছেলেদের উদার দৃষ্টি যাতে খোলে তার চেষ্টা করি।

টেক্স্ট বইয়ের যে একটা জগৎ আছে—তার সঙ্গে পরিচয়

করিয়ে দিতে আপনাকে রাখা হয় নি এখানে? Know this school to be a machine for turning out matriculates—আপনাকে আর কত শেখাবো বলুন—

যদুবাবু, ক্ষেত্রবাবু ও রাখালবাবু, নারাণবাবুকে জিগ্যেস করেন শিক্ষকদের বিশ্রাম ঘরে—ব্যাপারটা কি হয়েছিল নারাণবাবু? সব শুনে যদুবাবু খুব লাফঝাঁপ দেন।

—আমি হোলে অমন হেড মাস্টারকে দেখিয়ে দিতাম। দু-কথা দিতাম শুনিয়ে আচ্ছা করে। সিলেবাস শেখাতে এসেচে? সিলেবাস্? অন্ত্যজ কোথাকার। মুখের মত জবাব দিয়ে দিতাম আজ—

ক্ষেত্রবাবু বলেন—একটু আস্তে—আস্তে—

—কিসের আস্তে, ভয় করি নাকি? এ শর্মা কাউকে থোড়াই কেয়ার করে তা বলে দিচ্ছি।

স্কুলের চাপরাশি এসে ডাকলে—হেড মাস্টারবাবু যদুবাবুকে ডেকেচেন—

যদুবাবু হঠাৎ বাতাস বের হওয়া বেলুনের মত চুপসে গেলেন। হেড মাস্টারের ঘরে জড়িত পদে ঢুকে বললেন, আমাকে ডেকেচেন?

—হ্যাঁ, আপনি শনিবার ফোর্থ ক্লাসের উইকলি পরীক্ষার নম্বর এখনো কেন দেন নি ?

—আজ্ঞে—আজ্ঞে—

—না, যত্নবাবু! আজ ন'দিন হয়ে গেল—কাজে আপনার বড় গাফিলতি হচ্ছে। গতবারও এমনি করেছিলেন আপনি। এ রকম আর কখনো করবেন না আশা করি। ওতে ছেলেদের অসুবিধে হয়। বুঝলেন!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। স্যার আমার শরীরটা একটু খারাপ ছিল বলেই, নইলে এতদিন—

—আচ্ছা, এখন আসুন তবে।

শিক্ষকদের বিশ্রাম ঘরে ফিরে আসতেই অন্য সব মাস্টার আগ্রহে জিগ্যেস করেন—কর্তা কি জন্যে ডেকেছিলেন হে ? যত্নবাবু হাত-পা নেড়ে বলেন—দিয়ে এলুম শুনিয়ে তু-কথা। আমায় বলে কিনা ফোর্থ ক্লাসের খাতা ফেরত দিতে অত দেরি হোল কেন ? আমি মুখের ওপর বলে এলাম মশাই, চল্লিশ টাকা মাইনেতে তো চলে না, আমাদের টুইশানি করে খেতে হয়। সময় পাই কখন যে খাতা সকাল সকাল দেখে দেবো ? দিলাম শুনিয়ে।

—বললেন ওই কথা ?

—বলবো না? এ শর্মা থোড়াই কেয়ার করে। হি মাস্ট বি টোল্ড সাম হোম ট্রুথ্—

পাশের বাড়িতে রেডিওতে গান হয়। ও যেন একটি অন্য জগৎ, রসের জগৎ। যে জগতের সঙ্গে শিক্ষকদের কোনো পরিচয় নেই। শিক্ষকেরা কান পেতে শোনেন।

বেরিয়ে এসে সবাই একটা চায়ের দোকানে বসেন। ভাঙা পেয়ালায় চা খান। নারাণবাবুর অপমানে সবাই দুঃখিত। রাখালবাবু বলেন—যেদিন এদেশে শিক্ষকতার কাজ সম্মানিত বলে বিবেচিত হবে, সেদিন বুঝতে হবে জাতি হিসেবে আমরা জেগেছি। আজ আমাদের স্থান কোথায়, নারাণবাবুর ওপর মাখনবাবুর ব্যবহারেই বুঝে নেওয়া যাবে।

রাখালবাবু নারাণবাবুকে নিজের বাড়ি নিয়ে যান। বড় শ্রদ্ধা করেন তিনি তাঁর এই সরল অকপট উদার দৃষ্টিসম্পন্ন সহকর্মীটিকে। রাখালবাবু বিদেশী শিক্ষক, এখানে তাঁর বাসা। বাসাতে তাঁর স্ত্রী, তিনটি ছেলেমেয়ে ও ভাইঝি নিভা থাকে। নিভার বয়েস বছর আট নয়, ফ্রক পরা ফুটফুটে মেয়েটি। নারাণবাবু তাকে কাছে ডেকে আদর করেন।

নারাণবাবুর মেয়ে অমলার শ্বশুর বাড়ি। অমলার শাশুড়ী তার ওপর অত্যন্ত কুব্যবহার করে। ছেলে সুকুমারের সঙ্গে অমলার দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ। অমলা সেজেগুজে জানলায় বসে আছে—আজ স্বামী কলকাতা থেকে আসবে অনেকদিন পরে।

শাশুড়ী এসে বলেন—বলি, হ্যাঁগা বৌমা, বিকেলে ঝাঁট নেই, পাট নেই—দোরে জল দেওয়া নেই—অমন পটের বিবি সেজে জানলায় বসে রয়েছ কেন? সে গুড়ে বালি। সুকু আজ আসবে না চিঠি লিখেচে। তুমি উঠে গিয়ে ছাদ থেকে কাপড়গুলো নিয়ে এসো আর এ বেলার ভাত চড়িয়ে দাও গে।

অমলা সলজ্জ মুখে উঠে গেল রান্নাঘরে। তার মন ভেঙে গিয়েছে। স্বামী সে কথা তো গতবার বলে যান নি? শাশুড়ী মিথ্যে কথা বলেছিলেন।

সন্ধ্যার ট্রেনে সুকুমার এল। অমলার জন্যে শাড়ি নিয়ে—নিজে আহ্লাদ করে দেখাতে গেল। মা কাপড়খানা ছিনিয়ে নেন ছেলের হাত থেকে। বলেন—এ আমার পাঁচীর সাধের সময় তাকে দেবো। বৌয়ের জন্যে আর রোজ রোজ কাপড় আনতে হবে না। যে গুণধর বৌ। সংসারের কুটোটুকু দু-খানা করে উপকার নেই। সারা বিকেল

সেজেগুজে ঠায় বসে রইল জানলায়। বলে, কোনো কাজ করতে পারবো না। যেমন হেজল দাগড়া তেমনি বদমাইস। হবে না? ছোট ঘরের মেয়ে যে! ওর বাবার নাম পাগলা মাস্টার।

অমলা আড়াল থেকে স্বামীকে দেখবার জন্যে এসে দাঁড়িয়েছিল। বাবার প্রতি অমন অপমানসূচক শব্দ প্রয়োগে সে আর স্থির থাকতে পারে না।

সামনে এসে বলে—বাবার নামে অমন যা তা বলবেন না আপনি। আমি কি করেচি না করেচি আপনাদের তা জানি নে, কিন্তু আমার বাবা যে কারো কোনো অনিষ্ট করেন নি বা করতে পারেন না এটা আমি ভালো করেই জানি।

শাশুড়ী ঠাকরুণ রণচণ্ডী মূর্তি ধারণ করলেন। ছেলেকে দিব্যি দিলেন সে যেন ও বৌয়ের মুখদর্শন না করে। অনেকরাত্রি জেগে দু-জন দু-জানলায় বসে রইল।

সেদিন নারাণবাবু আহার করতে বসে বললেন—এঁচড় কোথা থেকে পেলে? অসময়ে এঁচড়।

মনোরমা বললেন—আমি জানি নে, ননীমাধব কোথা থেকে এনেচে।

নারাণ মাস্টার বললেন—কোথা থেকে আনবে? এ নিশ্চয়

অন্য কারো গাছ থেকে চুরি করে এনেচে। আমাদের নিজেদের গাছ নেই—কেই বা দেবে অসময়ে? বলি শোনো, চুরির জিনিস আমার পেটে সইবে না। আমার সংসারে কেউ খাবে না। ফেলে দাও সবটুকু।

মনোরমা অনেক যত্ন করে দরিদ্র সংসারে অসময়ের এঁচড় রেঁধেছিলেন। স্বামী খেতে ভালোবাসেন বলে তাঁর অত আগ্রহ। এই আগ্রহের জিনিসটা নির্মম ভাবে ফেলে দিতে তাঁর চোখে জল এল। কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না মুখে। তিনি তাঁর স্বামীকে খুব ভাল ভাবেই চেনেন। অনুনয় বিনয়ে এক্ষেত্রে কোনো ফল হবে না। অভিমান করে চুপ করে রইলেন।

মনোরমাকে বুঝিয়ে বললেন নারাণ মাস্টার। দেখো, ছেলেকে শুধু উপদেশ দিলে কাজ হবে না। "আপনি আচরি ধর্ম পরকে শিখাই"—আমরা পিতামাতা, এই আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র হওয়া দরকার। মুখে বলি, অথচ চুরির এঁচড় রেঁধে খাই—এতে ছেলেপিলে ভালো উপদেশ কখনো নেবে না। আমি জানি তোমার মনে কষ্ট হয়েচে, কিন্তু আমি যে পিতা, তুমি যে মা—আমরা যে শিক্ষক।

নারাণ মাস্টারের ক্লাসে জানলা বন্ধ ছিল। তিনি ক্লাসে গিয়েই জানলা খুলে দিতে বলেন।

ছেলেদের বলেন—মনের জানলাও সব সময় ঐ রকম খুলে রাখতে হবে। দ্যাখো তো কেমন নীল আকাশ? চোখকে তৈরি করো বাইরের সৌন্দর্য দেখতে। জীবনে মস্ত আনন্দ পাবে।

হেড মাস্টার বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। একটু পরে ডেকে পাঠালেন।

—কেন ডেকেচেন স্যার?

—এদিকে আসুন, বসুন দয়া করে।

নারাণ মাস্টার বসেন। হেড মাস্টার বলেন—আপনাকে কথাটা বলি। আপনার অঙ্কের ফল অত্যন্ত খারাপ এবার। কাল পরীক্ষার নম্বর আনিয়েচি ইউনিভারসিটি থেকে। ছ-টা ফেল অঙ্কে। আপনি এদিকে দেখি ক্লাসে বসে আর্টের চর্চা করেন। সেজন্যে কি আপনাকে রাখা হয়েচে স্কুলে? কতবার না আপনাকে একথা আমি বলেচি? বড় দুঃখের বিষয় নারাণবাবু।

নারাণবাবু চুপ করে থাকেন। সাহস করে কিছু বলতে পারলেন না।

রাখালবাবু টিচার্স রুমে বসে সব কথা শুনে বলেন—ও, আর

ওঁর সাবজেক্টে যে এগারটা ফেল। তার বুঝি কোনো কৈফিয়ত নেই? গরীবের ওপর যত জুলুম। বেশ!

বাজারে এসে সেই দোকানে মাস্টারেরা ভাঙা পেয়ালায় চা খান। সেখানে রাখালবাবু কথাটা তোলেন। স্কুল কমিটির অবিচার সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়। একজন মাস্টার (যত্নবাবু) বলেন শুধু টিউশনি করি সকাল থেকে পাঁচটা। বিকেলে আরো পাঁচটা। তাতেও কি সংসার সুচারু রূপে চলে? একটি বড় মেয়ে ঘাড়ে। দেশের তরুণদের যাঁরা গড়ে তুলবেন, গোটা জাতিটিকেই তাঁরা গড়ে তুলচেন—তাঁদের দিকে কে তাকায়?

ভগ্নমনে যে যাঁর বাড়ি যান। সন্ধ্যা হয়ে আসে।

যত্নবাবু বলেন—তোমরা যাও, আমি আবার গুণী মল্লিকের বাড়ি প্রাইভেট পড়াতে যাবো।

—খেলেন না কিছু? বাড়ি যাবেন না?

—বাড়ি গেলে সময় পাবো কখন? ওই কোনোদিন রাস্তায় খেতে খেতেই পথ চলি দু-এক পয়সার বিস্কুট কি মুড়ি। কোনোদিন তারও সময় হয় না। আমাদের আবার খাওয়া, তুমিও যেমন ভায়া!

স্কুলে প্রাইজ বিতরণ উপলক্ষে সভা। সভায় নারাণ মাস্টারের ছাত্র ইন্দুভূষণ চমৎকার আবৃত্তি করলে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাকে ডেকে জিগ্যেস করলেন। এমন আবৃত্তি শিখিয়েচে কে ?

—নারাণ মাস্টার।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নাম মিঃ কান্‌ওয়ার। পাঞ্জাবী। কেম্ব্রিজের গ্রাজুয়েট। নারাণ মাস্টারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওঁর বাড়ি আসেন। পথে মাখন সুর কি একটা কথা বলতে গেলেন খোসামুদের ভাবে হাত জোড় করে—স্যার, আমাদের অয়েল মিলের লাইসেন্সটার বিষয় একবার—

মিঃ কান্‌ওয়ার বিরক্তির সুরে বললেন—আভি নেই—নট নাউ—কাম এ্যাণ্ড সি মি ইন্ মাই অফিস্—

মিঃ কান্‌ওয়ারকে নারাণ মাস্টার পল্লী প্রকৃতির সৌন্দর্য বোঝান। জ্যোৎস্না রাত্রি। মিঃ কান্‌ওয়ার বলেন—মিঃ গাঙ্গুলি, আপনি একজন আইডিয়াল টিচার—আপনি আমাকেও Rural Bengal-এর রূপটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন—আমি আপনাকে মনে রাখবো—

মনোরমা ভাঙা পেয়ালায় দু-জনকে চা দেন।

মাখন সুরের বাড়িতে ক্রিয়াকাণ্ড। সব মাস্টার ভূতের মত

খাটচেন। কেউ অভ্যর্থনা করচেন, কেউ রান্নার তদারক করচেন।

নারাণ মাস্টারকে মাখনবাবু বলেচেন চা দেওয়া পরিদর্শন করতে। সার্কেল অফিসার মিঃ সুধীন বসুকে চা নিজের হাতে দিতে বলেন। নারাণবাবু চা দিতে গেলে তরুণ মিঃ বসু উঠে চায়ের কাপ নিয়ে বলেন—স্যার আপনি কেন? রাখুন, রাখুন —আমায় চিনতে পারলেন? আমি সুধীন। আপনার ছাত্র।

নারাণ মাস্টার বলেন—কোন্ বছর পাস করেছিলে বাপু, এসো এসো, দীর্ঘজীবী হও। মনে তো হচ্ছে না।

—মানিকদের ব্যাচ, উনিশশো ত্রিশ সালে ম্যাট্রিক পাস করি স্যার। আপনি আমার গুরু।

—বেশ, বেশ বেঁচে থাকো বাবা, আজকাল তুমি কি আমাদের সার্কেল অফিসার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

—আমাদের বাগদি পাড়ায় একটা টিউবওয়েল করে দিতে পারো বাবা? খালের নোংরা জল খেয়ে সব কলেরায় মরচে। আমার দুটি ছাত্র মারা গিয়েচে। ওরা গরীব, তোমাদের সামনে অভাব অভিযোগ জানাতে পারে না। এই কাজটি তোমার গুরু-দক্ষিণা হবে বাবা, যখন গুরু বলে ডাকলে তখন বলি।

ছেলেটি খাতা বের করে বললে—গ্রামের নাম আর পাড়াটা বলুন স্যার। টুকে নি। আজকাল ভালো কাজ করবো বললেও করা যায় না, আপনি পণ্ডিত লোক, আপনাকে কি বোঝাবো! বিদেশী শাসন চলেচে শোষণের জন্যে, প্রজার মঙ্গলের জন্যে নয়। গভর্ণমেণ্টের কাজে ঢুকে সেটা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝচি—আচ্ছা স্যার প্রণাম। পায়ের ধুলো দিন আর একবার।

ছেলেটি বিদায় নিতে উদ্যত হোলে মাখন স্থুর হাত কচলাতে কচলাতে তার পেছন পেছন খানিক দূর গেলেন।

আরো খানিকক্ষণ খেটে বেলা গেলে নারাণ মাস্টার অভুক্ত অবস্থায় বাড়ি চলে গেলেন। কেউ জিগ্যেসও করলে না তিনি খেয়েচেন কিনা।

মাখন স্থুর যাবার আগে কেবল বললেন—নারাণবাবু, কাল একটু সকাল সকাল আসবেন, ভাল চণ্ডীর গানের আসর হবে কিনা। থানার বড় দারোগাবাবু আসবেন খবর দিয়েচেন।

*　　　*　　　*

ছ বছর পরে।

রাখালবাবুর বাড়ি তাঁর স্ত্রীর কলেরা। নারাণ মাস্টার ছাত্র-দল নিয়ে সেবা করচেন। ছেলেদের মধ্যে ইন্দুভূষণই পরিচালক। সবাই ব্যস্ত, কেউ জল গরম করচে, কেউ ডাক্তার বাবুর হাতে সাবান দিয়ে জল ঢেলে দিচ্ছে। রাখাল মাস্টারের মেয়ে প্রীতি ইন্দুভূষণকে সাহায্য করে। কৃতজ্ঞতায় প্রীতির তরুণ হৃদয় কানায় কানায় ভরা। রাখালবাবুর স্ত্রী রাত্রে মারা গেলেন। প্রীতিকে ইন্দু বোঝায়। এর আগেও ইন্দুর সঙ্গে প্রীতির দেখা হয়েচে দু-একবার। নারাণ মাস্টার রাখালবাবুর বাসায় খবরের কাগজ আনতে পাঠাতেন, প্রীতিই কাগজখানা ইন্দুভূষণের হাতে দিত।

কৃতজ্ঞতা প্রেমে পরিণত হোল ক্রমশঃ। মাতৃবিয়োগের পর শোকাচ্ছন্ন দিনগুলিতে ইন্দুভূষণ সান্ত্বনা দিত ওকে। রাখাল মাস্টার বাড়ি থাকতেন না। দু-জনে প্রেম গড়ে উঠলো। ইন্দুভূষণ ম্যাট্রিক পাস করে তখন কলেজের ছাত্র। কিন্তু নারাণবাবুর বাড়িতে সে নিয়মিত আসে।

মনোরমা বয়স ও দারিদ্র্যের ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়েচেন। ছেলে অবাধ্য, লেখাপড়া করলে না, দু-বার ম্যাট্রিক ফেল করেচে। মাকে এসে বলেচে, মা একটা কলের গান কিনবো,

টাকা দাও। মা বললেন—কি করে বলিস এসব কথা ননী? ওঁর বয়স হয়েচে, সংসারের জন্যে ওঁর এখন চিন্তা এসে পড়েচে, আগে তো গায়ে আঁচড় লাগাতে দিতাম না। এখন ভালো করে একবাটি দুধ খেতে দিতে পারি নে। তোকে কলের গান কেনবার টাকা কোথা থেকে দেব।

ছেলে মার সঙ্গে ঝগড়া করে—সমান উত্তর করে। অবশেষে বাবার পায়ের শব্দ পেয়ে খিড়কি দোর দিয়ে বেরিয়ে চলে যায়।

নারাণ মাস্টার ঢুকে স্ত্রীকে চোখ মুছতে দেখে বলেন—কি হোল, চোখে কি? তিনি তো সংসারের কিছু খবর রাখেন না। স্ত্রী বলেন—চোখে কি হয়েচে, সব সময় জল পড়চে।

ওঁর মেয়ে আবার চিঠি দিয়েচে। মনোরমা বলেন সে কথা স্বামীকে। ওকে একবার দেখে এসো না গো! ওদিকে তো যাও। নারাণ মাস্টারের মনটা কেমন করে ওঠে। পাশের গ্রামে যাবার সময় ওর শ্বশুর বাড়ির সামনে দিয়ে যান। মেয়ে জানলায় দাঁড়িয়ে আছে। জামাইয়ের সঙ্গে দেখা। জামাই বলে, আসুন বাড়িতে। নারাণবাবু বলেন—সময় নেই, যাবো না, অমলাকে বুঝিও।

বাড়ি এলে মনোরমা বলেন,—হ্যাঁগা, তুমি গিয়েছিলে?

নারাণবাবু বলেন—হ্যাঁ, খুব যত্ন করলে। অমলার শাশুড়ী নিজে এসে কত কথা বললে। জল খাওয়ালে।

প্রীতি ও ইন্দুভূষণের শেষ দেখা। প্রীতির বিয়ে অন্য স্থানে স্থির হয়েচে। প্রীতির অভিভাবকদের হাত এতে সম্পূর্ণ; বেচারী প্রীতি নিরুপায়া, সে শুধু জানাতে এসেচে গোপনে ইন্দুভূষণকে। বাড়ির পিছনে এক জামতলায় তু-জনে এসে দাঁড়িয়েচে। প্রীতি বললে—আমি কি করবো ইন্দু-দা, আমি কি করতে পারি? আমি তোমার সঙ্গে পালাতে পারি, কিন্তু বাবা তাতে মরে যাবেন। তা করতে পারবো না।

প্রীতির বিবাহের পরদিনই সকালে উঠে মনোরমা দেখলেন ছেলে ননীমাধব ঘরের দোর খুলে রেখে মায়ের বাক্স ভেঙে তিনশো টাকা ও বাবার সাবেক আমলের ঘড়িটি নিয়ে কোথায় পালিয়ে গেছে। একখানা চিঠি খুঁজে পাওয়া গেল, তাতে সে লিখেছে, বৃহত্তর জগতের আহ্বানে আজ সে বাড়ি ছেড়ে চললো, বাবা-মা যেন কিছু মনে না করেন। নারাণ মাস্টার স্ত্রীকে বোঝান।

মনোরমা বলেন—হ্যাঁগা, তুমি যাও, ওকে এনে দাও।

—যাবো, ভেবো না।

—হ্যাঁগা, সে কোথায় গেল ?

—ভেবো না।

—তাকে এনে দেবে ?

—হ্যাঁ এনে দেবো।

এমন একদিনে নারাণবাবুর চাকরি গেল। এর মস্ত কারণ একজন দেশসেবকের মৃত্যুতে নারাণবাবু ছেলেদের নিয়ে গাছতলায় দাঁড়িয়ে সভা করেছিলেন।

ছেলেদের বিদায় অভিনন্দন হোল গাছতলাতেই। নারাণ-বাবু গ্রহণ করলেন। হেড মাস্টার ও মাখন স্যর স্কুল গৃহে উক্ত অভিনন্দনের অনুষ্ঠান করতে দিতে রাজি হোলেন না। বিদায়ের সময় নারাণবাবুর মর্মস্পর্শী বাণীতে সকলের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো।

নারাণবাবু অভিনন্দন-পত্র হাতে হেঁটে আসচেন, মাখন স্যর পাশ দিয়ে ফিটন গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলেন।

গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের সভা। মাখন স্যর এলে সবাই দাঁড়িয়ে উঠলো—অথচ নারাণবাবু যে বেঞ্চিতে বসে, সেই

বেঞ্চিতে বসে সাধারণ লোকে বিড়ি খাচ্চে। পেছনের বেঞ্চিতে বসে আছেন নারাণবাবু, জায়গা না পেয়ে। মাখন স্থুরের বক্তৃতা শুনচেন।

মাখন স্থুর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বর হবেন, জনসাধারণের ভোট চান। বক্তৃতায় তিনি বলচেন, তিনি আজ অনেকদিন ধরে দেশের সেবক ও ভৃত্য তা সকলেই জানেন। স্কুল ও সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় নিয়ে তিনি কি রকম প্রাণপাত পরিশ্রম করেচেন, তা যে সার্থক হয়েচে—এতেই তিনি ধন্য। অন্য কোনো প্রতিদান তিনি চান না, কেবল দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ছাড়া ইত্যাদি। খুব চটপট হাততালি পড়চে।

বাইরে এসে নারাণবাবু বিড়ি টানতে টানতে অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলেন। লোকের কাছে বলেন—চমৎকার লোক মাখন-বাবু। কেমন চমৎকার বক্তৃতা দিলে। দেশের মধ্যে অমন লোক আর নেই। বড় ভদ্র লোক।

এক জায়গায় বসে ছেলের কথা ভাবেন। পরের ছেলে মানুষ করেচেন অথচ নিজের ছেলের কিছুই করতে পারলেন না। চোখের সামনে ছবি ভেসে উঠলো। ছেলেটা হয়তো পথে ভিক্ষে করচে। হয়তো অনাহারে কষ্ট পাচ্চে। চোখের জল মুছলেন চাদরের খুঁটে।

মনোরমা বৈকালে অন্যমনস্ক ভাবে একলা বসে বাড়িতে। স্ত্রীর চেহারা দেখে নারাণবাবুর বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। পতিব্রতা স্ত্রী বাইরে কিছু প্রকাশ করে না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার সমস্ত অন্তর পুড়ে উঠেচে আজ নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের জন্যে।

পেছন থেকে নারাণবাবু স্ত্রীর শোকাচ্ছন্ন বিষাদ মলিন মূর্তি দেখেন।

তাঁকে আসতে দেখে মনোরমা ধড়মড় করে উঠে বলেন—ওমা, কখন এলে তুমি? আমি টের পাই নি।

—এই তো এলাম। লেবুর আচার করবে বলে লেবুর সন্ধানে গিয়েছিলাম।

—সত্যি তাই নাকি? পেলে?

মনোরমা কৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে বলেন—দাঁড়াও তোমার মুখ শুকিয়ে গিয়েচে, দুটো মুড়ি মেখে দিই।

নারাণ মাস্টার বলেন—বোসো বোসো। একটু গল্প করো। খেটে খেটেই গেলে।

মিনতিভরা স্বরে মনোরমা বলেন—হ্যাঁগা, ননীর কোনো সন্ধান পেলে?

ইন্দুভূষণ একটা ঘাটে একদিন । আছে, সেখানে বিখ্যাত সিনেমা অভিনেত্রী সুরমার স ার আলাপ হয়। সুরমা ও তার দলবল পল্লীগ্রামের দৃশ্য তুলতে এসেছিল। ওর সাহায্য চাইলে। সেই সূত্রে সুরমার সঙ্গে প্রথম আলাপ।

সুরমা ওকে কলকাতায় গিয়ে দেখা করতে বললে বারবার— আসবেন তো? ঠিক বলুন?—বালিগঞ্জের একটা ঠিকানা দিলে। সেখানে ইন্দুভূষণ দেখা করতে গেল এবং প্রথম পদার্পণের দিনই সুরমার জালে আবদ্ধ হোল। সুরমা সুন্দরী সুগায়িকা; ইন্দুভূষণ তরুণ ও সুদর্শন। দু-জনই দু-জনের প্রতি আকৃষ্ট হোল। সুরমা বার বার আসতে বললে ওকে, জানলায় দাঁড়িয়ে রইল।

বাড়ি এসে ইন্দুভূষণ মনমরা, উদাস হয়ে রইল। সুরমার চিঠি এল—একবার অতি শীঘ্র যেতে বলেচে।

সে গেল আবার। সুরমা ওকে খুব আদর আপ্যায়ন করলে। নিজের হাতের তৈরি সন্দেশ খাওয়ায়। গান শোনায়। শেষে সুরমা বলে—অনেক রাত হয়েচে, কোথায় যাবেন আজ? এখানেই থাকুন। কোনো অসুবিধে হবে না। দু-জনে সারারাত গল্প করি আসুন। সত্যি কথা বলতে কি আপনাকে বড় ভাল লাগে।

ইন্দুভূষণ রইল না। সুরমা বার বার বলে দিলে—সামনের

অনুসন্ধান

শনিবারে আমার জন্মদিন। নেমন্তন্ন রইলো আপনার। কথা দিন আসবেন ?

গেল ইন্দুভূষণ জন্মদিনের উৎসবে। গান, আহার-বিহার। আরো কয়েকটি অভিনেত্রী নিমন্ত্রিতা। তারা ওদের দু-জনের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে অভ্যর্থনা করে। সেদিন সুরমা ইন্দুভূষণকে বাড়ি যেতে দেয় না। ছাদে বসে দু-জনে গল্প করে।

সুরমা ও ইন্দুভূষণ মোটরে যায়, নারাণ মাস্টার পথ দিয়ে যান। তিনি কলকাতায় এসেছিলেন ছেলের সন্ধানে, মনোরমার মিনতিতে। সারাদিন নানাস্থানে ঘুরেচেন সন্ধান করে, কোথাও সন্ধান পান নি। সামান্য পয়সা হাতে, পেট ভরে জলখাবারও খেতে পারেন নি। ভবানীপুরে বকুল বাগান রোডের মোড়ে গাড়িখানা হঠাৎ বেগে সামনে এসে দাঁড়ালো। নারাণ মাস্টার থমকে দাঁড়ালেন। কাদাজল জমেছিল রাস্তার এক জায়গায়, ছিটকে তাঁর গায়ে লাগলো। নারাণবাবু চেয়ে দেখলেন ইন্দুভূষণ ও একটি সুবেশা তরুণী গাড়িতে বসে। পাশের একটি লোক বলে উঠলো—রগড় দেখলেন মশাই ? চিনেচেন তো ?

নারাণ মাস্টার পাড়াগাঁয়ে মানুষ। তিনি কি করে চিনবেন!

—চিনলেন না? সুরমা দেবী?

—সে কে?

—কোথায় বাড়ি আপনার? সুরমা দেবী বিখ্যাত চিত্র-তারকা—নামও শোনেন নি? এঃ আপনার কাপড়খানা একেবারে নষ্ট করে দিয়েচে যে!

নারাণবাবু চিনতে পারলেন। সরল মানুষ, জিনিসটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। অবাক হয়ে গেলেন। একজন চিত্র অভিনেত্রীর সঙ্গে ইন্দুভূষণ কি করচে? ও কি কোনো ফিল্ম কোম্পানীতে কাজ নিল নাকি? কিন্তু তাঁর ছাত্র, অমন যত্নে গড়ে তোলা ছাত্র শেষে একটি অভিনেত্রীর সঙ্গে বেড়াবে এ ভাবে?

ইন্দুভূষণ চিনতে পেরেছিল নারাণ মাস্টারকে। সে চমকে উঠে, তার পর থেকে অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

সুরমা বললে—আচ্ছা, হাজরার মোড়ে সেই যে এক পাড়াগেঁয়ে বুড়ো লোক আমাদের মোটরের সামনে পড়লো—ওমা, কি কাদাই লেগে গেল ওর গায়ে। ভাবলেও হাসি পায়—ব্রেক কষেছিল সময়ে। তাই খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েচে, তার পর থেকেই তুমি অমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলে কেন? আর ভাল করে কথা কইচ না? চেন নাকি ও বুড়োকে?

ইন্দুভূষণ চুপ করে থেকে বললে—আচ্ছা, তোমার আবার যত কথা। ইয়ে, আমি তোমার সঙ্গে এখন আর যাবো না সুরমা।

—কেন ?

—আমায় একটু নামিয়ে দাও। একটু কাজ আছে।

—কোথায় যাবে ?

—সে বলবো এখন। তুমি যাও আমি নামি।

অনেকক্ষণ ধরে খুঁজলে ইন্দুভূষণ নারাণ মাস্টারকে। এদিক ওদিক। কিন্তু কোথাও খুঁজে না পেয়ে একটা পার্কে এসে ক্লান্ত হয়ে বসলো। নিজেকে কোথায় যেন অপরাধী বলে মনে হোতে লাগলো—নিজের কাছেই নিজেকে। না, সে সুরমার কাছে আর যাবে না। বাড়ির ছেলে বাড়ি ফিরে যাবে আজই।

এইখানে একটু পরে প্রীতি ওকে দেখতে পেলে সামনের জানলা থেকে। সেটা প্রীতিদের বাসা। একটি ছোট ছেলে এসে ওকে ডাকলে। ইন্দুভূষণ দ্বিধাজড়িত পদে অপরিচিত দ্বারদেশে গিয়ে দাঁড়াতেই দোর খুলে দাঁড়ালো প্রীতি হাসিমুখে।

—ইন্দু-দা।

—প্রীতি!

—এসো বাড়ির মধ্যে। কবে কলকাতায় এলে? কি করচো আজকাল? তুমি এসো বাড়ির মধ্যে।

—বাড়িতে আর কে আছেন?

—কেউ নেই। কেবল এক ননদ ও বৃদ্ধা খুড়শাশুড়ী। উনিও আসবেন এখুনি। তুমি এসো ইন্দু-দা।

—আমি যাবো না প্রীতি। একটু বিশেষ ব্যস্ত আছি। অন্য সময়ে এসে দেখা করবো।

—তা হবে না। এক পেয়ালা চা অন্ততঃ খেয়ে যেতেই হবে।

এই প্রীতিকে ভুলতেই সে সুরমার ফাঁদে পা দিয়েছিল। সেই প্রীতি আজ তার সামনে।

গ্রামের সম্বন্ধে অনেক কথা হোল। তারপর ইন্দুভূষণ বিদায় নিলে।

নিয়েই সোজা সুরমার ওখানে গিয়ে উঠলো সে।

মনোরমা ছেলের জন্যে ভেবে ভেবে শয্যা গ্রহণ করেচেন। নারাণ মাস্টার বাড়ি এলে তিনি উঠে স্বামীকে জল দেন

হাত-পা ধোবার। প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে চা এনে চা করে খাওয়ান—কারণ ঘরে কিছুই নেই। মূর্তিমান দারিদ্র্য সংসারের প্রতি রন্ধ্রে তার পাশ বিস্তার করেচে। চাকরি নেই নারাণবাবুর। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সব টাকা আদায় হয় নি।

মনোরমা করুণ মিনতির সুরে বলেন—হাঁগো, ননীর কোনো সন্ধান পেলে? নারাণবাবু কি জবাব দেবেন। কোনো সন্ধানই মেলে নি। সে কথা বলতেও কষ্ট হয়।

নারানবাবু কাছে বসে স্ত্রীকে বোঝান। ভগবানের নাম করো। সংসারে সব দুঃখ কষ্টকে যে জয় করতে পারে, সেই তো যথার্থ মানুষ। সংসার পরীক্ষার স্থল। এই মনে করে চলবে যে আমাদের সত্যকার স্বাধীনতাকে কেউ হরণ করতে পারে না।

হাতে পয়সা নেই। স্কুলে প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকা বাকি। স্কুলে যান নারাণবাবু। ছেলেরা সবাই ক্লাস থেকে বার হয়ে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে, উল্লাস প্রদর্শন করে। হেড মাস্টার সদয় ব্যবহার করেন। চেয়ারে বসিয়ে বলেন—আপনি শুনলাম কলকাতায় গিয়েছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলেন ?

—না।

—শুনলাম আপনার স্ত্রী অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছেন ? আহা, তা তো হোতেই পারেন। I Offer my sympathy Naran Babu—কিন্তু কি করবেন বলুন। সবই তাঁর ইচ্ছা।

হেড মাস্টারের কথায় মাখন স্থরের সঙ্গে দেখা করেন। মাখন স্থর বৈঠকখানায় বসে আছেন মো-সাহেব নিয়ে। নারাণবাবুকে তাঁরা বসতেও বলেন না। তিনি গিয়ে নমস্কার করে দাঁড়িয়েই থাকেন।

মাখনবাবু বললেন—এই যে আস্থন মাস্টার মশাই—ভাল আছেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এক রকম চলে যাচ্চে।

—তারপরে কি মনে করে ?

—আমার সেই প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকাটা অনেক দিন হয়ে গেল। সংসারে এখন বড় অভাব। টাকাটা আমার দেওয়ার ব্যবস্থা করুন দয়া করে।

—নিশ্চয়ই, সে টাকা দিতে হবে বই কি। আপনার ওপর স্কুল-লাইব্রেরির ভার ছিল, তার অনেকগুলো বই পাওয়া

যাচ্ছে না। সেগুলো আপনি মীমাংসা করে দিয়ে টাকা নিয়ে যান।

—সে কি কথা? এতদিন তো হেড মাস্টার কিছু বলেন নি? আর আমার ওপর লাইব্রেরির চার্জও ছিল না। সে ছিল ক্ষেত্রবাবুর ওপর। আপনি হেড মাস্টারের সার্কুলার দেখবেন।

—আচ্ছা এখন যান। আমি বড় ব্যস্ত।

—আমার হাত খালি। বাড়িতে স্ত্রী অসুস্থ। ছেলেটাকে সন্ধান করতে গিয়ে খরচপত্র হয়ে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে। বড্ড উপকার হোত এই সময় টাকাটা পেলে।

—সবই বুঝলাম। কিন্তু আমিও তো বেনিয়মে বেহিসেবে টাকা দিতে পারি নে? আমার এখন সময় নেই। এখন যান আপনি।

বাড়ি ফিরে এলেন নারাণ মাস্টার।

মনোরমার শরীর খারাপ। তার জন্যে কিছু ফল নিয়ে আসতে পারলেন না। এক দোকানে জোড়া সন্দেশ বিক্রি হচ্ছে, চার আনা জোড়া, মনোরমা এসব খেতে পান না, গরীবের ঘরের স্ত্রী। বড় ইচ্ছে হোল ঐ জোড়া সন্দেশ

একখানা নেবেন। কিন্তু পয়সায় না কুলোনোতে, শুধু হাতে চলে আসেন।

মনোরমা আগে আগে এসে আগ্রহপূর্ণ ভাবে বাজারের থলি খুলে দেখতেন—জিগ্যেস করতেন—কি আনলে দেখি? আজ তিনি নিরুৎসাহ, মনমরা উদাস। নারাণবাবু দেখে ব্যথিত হয়ে ওঠেন।

বাইরে ছেলেরা এসে ঠিক ডাকে প্রতিদিনের মত। এখন আবার অন্য ছেলেদের নক্ষত্র বোঝান। ভাবেন ইন্দুভূষণের গাড়ির চাকায় সেদিন কাদা ছিটকে লাগার দৃশ্য, সঙ্গে অভিনেত্রী শ্রেণীর একটি মেয়ে। দুঃখ হয় তাঁর।

সুরমাকে নক্ষত্র চেনাচ্ছে ইন্দুভূষণ। ছাদের ওপর অন্ধকার। তারা ভরা আকাশ।

সুরমা বললে—এই সব শিখে কি হবে? তার চেয়ে চলো—

—জানো আমার এক মাস্টার মশাই ছিলেন। তিনি আমার ছেলেবেলায় আমায় এসব চিনিয়ে ছিলেন। তিনি বলতেন, মানুষের দৃষ্টি যত প্রসারতা লাভ করবে, ততই সে অমরত্বের সম্মুখীন হবে। মানুষ বড় কিসে? এই বৃহতের

সন্ধান—ভূমার সন্ধান সে পেয়েচে বলে—আমার গুরুর এই উপদেশ।

—তোমার গুরু কে? কোথায় থাকেন?

—তুমি তাঁকে দেখেচ।

—দেখেচি কোথায়?

—সে বলবো না।

—একদিন তাঁকে এখানে আনবে?

—আসবেন না তিনি। জীবনে বৃহতের সন্ধান তিনিই আমায় দিয়েছিলেন, এতদিন তত বুঝতে পারি নি। কিন্তু আজকাল যেন বেশি করে বুঝচি সুরমা।

সুরমার বিলাসিনী পল্লবগ্রাহী মন এ উক্তির গভীরত্ব বুঝতে পারলে না।

সে বললে—চলো নিচে যাই—তোমাকে গান শোনাই। ঠাণ্ডা লাগচে। মাঝে মাঝে তোমার মুখ গম্ভীর দেখি কেন বলো তো। তোমার কি অভাব এখানে? কোনো অসুবিধার মধ্যে কি আমি রেখেচি তোমাকে? চলো!

সুরমার গানে কথায় ইন্দুভূষণ জীবনের গভীর তত্ত্ব আবার বিস্মৃত হোল।

মনোরমা শয্যাগত। পুত্রের বিচ্ছেদশোক-কাতরা মাতাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নারাণবাবু নিজেই ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। ঠিক সেই সময় টেলিগ্রাম এল আলিপুরের জেল হাজত থেকে। তাঁর ছেলে ননীমাধব চুরির চার্জে অভিযুক্ত হয়ে আলিপুরে আছে।

স্ত্রীকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে নারাণ মাস্টার চলেন আলিপুরের দিকে। মনে পড়লো তাঁর একটি পুরনো গান—

কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া
বাহির হনু তিমির রাতে
তরণীখানি বাহিয়া
অরুণ আজি উঠেছে
অশোক আজি ফুটেছে
না যদি উঠে, না যদি ফুটে
তবুও আমি চলিব ছুটে
তোমার মুখে চাহিয়া।

আলিপুরের জেল হাজতে ছেলের সঙ্গে দেখা হোল। ওখানে গিয়ে শুনলেন তার ছ-মাস জেলের আদেশ হয়েচে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করার পরামর্শ দিলে সবাই। নারাণ মাস্টার গিয়ে দেখেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর পূর্ব পরিচিত মিঃ কান্‌ওয়ার।

খুব খাতির করলেন তিনি। বললেন, তিনি জানেন না যে আসামী তাঁর ছেলে। খুব বিস্ময় প্রকাশ করলেন এ কথা শুনে। কেন এমন হোল?

নারাণ মাস্টার চুপ করে থাকেন। পরে নারাণবাবু সব বললেন।

দুঃখ করে ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—আমি জানি, এরকমই হয়। পণ্ডিতের বংশে পণ্ডিত ও সৎ ছেলে জন্মগ্রহণ করলে তো পৃথিবী স্বর্গ হয়ে যেতো।

আচ্ছা আমি চলি, বললেন নারাণবাবু।

মিঃ কান্‌ওয়ার বললেন—আপনি আমাকে Rural Bengal চিনিয়েছিলেন। প্রকৃত বাংলা দেশ কি তা আমাকে চিনিয়েছিলেন আপনি। আমি কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। আমি যদি জানতাম আসামী আপনার ছেলে, তাহোলে ওকে কনভিকশন দিতাম না। বড়ই দুঃখিত আমি যে আমার অর্ডারে আপনার ছেলের জেল হোল। আমার বাসায় যাবেন না! আমার স্ত্রী আপনাকে দেখলে বড় খুসী হবেন।

—এখন আমার সময় হবে না মিঃ কান্‌ওয়ার। আমার স্ত্রী পুত্রের শোকে শয্যাগত। একা ফেলে রেখে এসেচি। আমায় আজই ফিরতে হবে।

—Really, I am so sorry। আপনার মত ভাল লোকেরা সংসারে কষ্ট ভোগ করে কেন বলতে পারেন মিঃ গাঙ্গুলী ? আপনি তো একজন দার্শনিক।

—কর্মফল।

—আমার কি মনে হয় জানেন, বেশি দুঃখ দহনের মধ্যে প্রভিডেন্স আপনাদের শেষ মালিন্যটুকু পুড়িয়ে খাঁটি নিষ্পাপ করে নিচ্ছেন। গেটের ফাউস্টের সেই লাইন স্মরণ করুন—একদিন আসবেন, আপনার সঙ্গে বসে আমার বাংলোতে কথাবার্তা বলা যাবে। Good bye।

নারাণবাবু বাড়ি এলেন।

মনোরমা সাগ্রহে জিগ্যেস করেন—হ্যাঁ গা, ছেলে কেমন আছে ? তাকে দেখলে ?

—দেখলাম ভালো আছে—

—তাকে আনলে না কেন ? ঠিক বলো—তোমার মুখ দেখে আমার ভালো মনে হচ্ছে না—সে আছে তো ?

—নিশ্চয়ই আছে—আমার কথা বিশ্বাস কর।

—হ্যাঁগো, তবে তাকে আনলে না কেন ? আমার বুকের এইখানটাতে হাত দিয়ে ছাখো। আমি থাকতে পারচি নে।

নারাণবাবু কিন্তু মুখ বুজে শুয়ে পড়ে থাকেন।

অসুস্থ স্ত্রীকে নারাণবাবু সত্যকথা বলতে পারেন না। নিজে সেবা করেন স্ত্রীর। স্ত্রী সেই অবস্থায় উঠে নিজে চা করে দিতে যান স্বামীকে। নারাণবাবু বাধা দেন।

একখানি চিঠি এল, ছেলে জেলের মধ্যে মনের ঘৃণায় আত্মহত্যা করেচে।

মিঃ কান্‌ওয়ার দুঃখ করে পত্র লিখেচেন।

নারাণবাবু গেলেন, পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিলেন। মুখাগ্নি করলেন।

বাড়ি ফিরে এলে মনোরমা ব্যস্তভাবে বলেন—ওগো, খোকা আমার কাছে রাত্রে এসেছিল। তুমি কোথায় গিয়েছিলে? বলো না? সত্যি করে বলো না? কথা বলো না কেন? কি হয়েচে? প্রায় মিনতির সুরে বলেন—হ্যাঁগা বলো না আমায়? বলো না সে কেমন আছে?

নারাণবাবু রোগশয্যাগত স্ত্রীকে নিজে বার্লি করে খাওয়ান।

—দাঁড়াও, আমি নিজে উঠে তোমায় চা করে দি—

—উঠো না। উঠো না। শুয়ে থাকো।

—হ্যাঁগা, ননী কেমন আছে? খোকা কেমন আছে?

বলো না—

—ভালো আছে। তার চিঠি পেয়েচি। সে বাড়ি আসবে। এই দ্যাখো চিঠি। কান্‌ওয়ারের ইংরিজি চিঠিখানা নারাণ মাস্টার স্ত্রীর সামনে মেলে ধরেন।

সন্ধ্যা হয়ে এল।

বাইরে থেকে ছেলেরা এসে হাঁক দেয়—স্যার, বাড়ি আছেন?

নারাণবাবু স্ত্রীকে শুইয়ে দিয়ে ছেলে পড়াতে যান বাইরে কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, তিনি একদল গ্রাম্য বালকদের মধ্যে বসে ভূগোল ব্যাখ্যা করচেন—

পৃথিবীর এক ভাগ স্থল, তিন ভাগ জল—

টান

টান

গল্প নয়, সত্য ঘটনা।

যাঁর মুখে আমার এ গল্প শোনা, তাঁদের পরিবারবর্গ কর্ম উপলক্ষে পূর্ব আফ্রিকার নাইরোবি শহরে অনেক দিন থেকেই বাস করেছিলেন, ও-দেশের নানা গল্প আমি বন্ধুটির মুখে সেদিন বসে বসে শুনেছিলাম।

সকালবেলা, পাহাড়ী-পথে একা বেড়াতে বার হয়েচি, একখানা জিপগাড়ি দেখি স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসচে, আমার বন্ধু প্রণববাবু গাড়িটি চালাচ্ছেন। অনেক দিন দেখি নি প্রণববাবুকে—তিনি কবে এখানে এসেচেন তাও জানি না।

আমাদের এদিকের বাজারে মালিয়া মোহান্তির বড় গোলদারি দোকান। তার কাছে জিগ্যেস করে জানলুম, প্রণববাবু আজ ছ-মাস ধরে 'হোমস্‌ডেল' কুঠিতে বাস করচেন।

মিনিট পঁয়ত্রিশ পরে (কারণ আমাকে পায়ে হেঁটে এই

পথটা যেতে হোল তো) প্রণববাবু ও আমি ছু-জনে বসে গল্প করছিলাম ও চা পান করছিলাম। অনেক দিন পরে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ এবং ছু-জনেই খুব খুসি হয়েছিলাম এই রকম হঠাৎ দেখা হওয়ায়।

প্রণববাবু বললেন—এখানে খেয়ে যাবেন।

—বাড়িতে বলে আসিনি, স্নান হয়নি—

—সব ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। তা হোলে থাকবেন তো, একটা খুব ভাল গল্প বলবো খেয়ে-দেয়ে ঐ বুড়ো হর্তুকিতলার ছায়ায় বসে। কেমন? ও লাখপতিয়া, এখানে এস—এই বাবুর বাড়ি গিয়ে খবর দিয়ে আসতে হবে।

—এখানে কতদিন আর থাকবেন?

—বুধবারে চলে যাবো। আজ দেখা হওয়াতে বড় ভাল হোল। কতদিন দেখা হবে না আর কে জানে।

—অথচ আমরা কলকাতাতেই থাকি, ঠিকানা না জানাতেই—

—মাংস খান তো?

—খুব।

—নিষিদ্ধ পক্ষীর?

—খুব।

টান

মধ্যাহ্ন ভোজন খুব ভালই হোল।

এর পর আমরা সেই হর্তুকিতলায় গিয়ে বসি। সামনে পশ্চিম দিকে নদীর ওপারে শৈলশ্রেণী, ঝির-ঝির বাতাস বইচে নদীর দিক থেকে। একদল সাদা বক পাহাড়শ্রেণীকে পেছনে ফেলে মেঘের তলা দিয়ে উড়ে আসচে এদিকে।

প্রণববাবু বললেন—আপনি আমার জীবনের কথা কিছু কিছু সকালবেলা শুনেচেন। আজ একটি অসাধারণ ঘটনার কথা বলবো। এ আমার নিজের চোখে দেখা বলেই আপনার কাছে বলবার ইচ্ছেটা বড় প্রবল হয়েচে।

আপনি জানেন, আমার বাবা ও কাকা উগাণ্ডা রেলপথ তৈরির সময় থেকে ওদেশে ছিলেন। আমার এক কাকা বেলজিয়ান কঙ্গোতে কমলালেবুর আবাদ করেন, আমার বাবার অনেক আগে থেকে তিনি আছেন সে দেশে, তাঁর চার-পাঁচটি ছেলে big game hunter। লোহার মত শরীর, অনর্গল সোহালি ভাষা বলতে পারে সে দেশের নেটিভদের মতই। এসব কথা গল্পের মত শোনাচ্ছে না কি? কিন্তু ঘর-বোলা লোকের কাছে হয়তো এ সব যতই গল্প বলে মনে হোক, আমরা জানি বাঙলা দেশের লোক কত দূরে দূরে

ছড়িয়ে আছে। আমাদের পৈতৃক বাসভূমি বলাগড়ের কাছে সিমুলিয়া। দশ বছর বয়সে আমি প্রথম নাইরোবি যাই। ভিক্টোরিয়া নয়ানজা হ্রদের তীরবর্তী কামপালা নামক ছোট শহরে সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলে একজন ভদ্রলোক স্কুল-মাস্টারী করতেন সে সময়—আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে সময়ে তিনি বিবাহ করেন নি, ছুটি-ছাটাতে নাইরোবিতে আমাদের বাসায় এসে বসতেন। তিনি দিনকতক আমার ইংরিজি পড়াবার ভারও নিয়েছিলেন।

সে সময়ে ওদেশে জিনিসপত্র খুব সস্তা ছিল—মাংস, দুধ, মাখন, কপি যথেষ্ট পাওয়া যেত। সমগ্র নাইরোবিতে তিন ঘর বাঙালী পরিবার ছিল। সকলেই উগাণ্ডা রেলপথের কর্মচারী। আর একজন ছিল খৃস্টান, ধর্মপ্রচার করবার কাজে কি এক মিশন কর্তৃক প্রেরিত, মাঝে মাঝে নাইরোবিতে থাকতো, মাঝে মাঝে দূর পল্লী অঞ্চলে চলে যেতো।

আমি পনেরো বৎসর একাদিক্রমে নাইরোবিতে ছিলাম বাবা-মার সঙ্গে। ওখানকার জীবন খুব ভালই কেটেছিল। জীবনযাত্রা ছিল সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ, জিনিসপত্র ছিল সস্তা, কত নতুন স্বপ্ন তখন দেখেছি অল্প বয়সে। একবার আমার খুড়তুতো ভাই অতুল এসে বেলজিয়ান কঙ্গোর জীবনের এক অপূর্ব ছবি আমার চোখের সামনে ধরলে, সেই আমার তরুণ

বয়সে। বাবাকে বললাম, কাকার কমলালেবুর আবাদে গিয়ে কাজ করবো, হাতী, সিংহ শিকার করবো, গল্পের বইয়ের নায়কের মত দুর্দান্ত এডভেঞ্চারপূর্ণ মুক্ত জীবনানন্দ আস্বাদ করবো।

আমি বললাম—তখন আপনার বয়েস কত ?

—সতেরো বছর।

—লেখাপড়া ?

—কামপালার সেই মাস্টার সীতানাথ বাঁড়ুয্যে ইংরিজি পড়াতেন আর স্টেশন মাস্টার ডসন সাহেবের মেমের কাছে অঙ্ক কষতাম। আমায় বড় ভালবাসতেন ডসন সাহেবের স্ত্রী। তাঁর এক ছেলে ছিল প্রায় আমার বয়সী। একটা এয়ার গান নিয়ে তার সঙ্গে খেলা করতাম। শিকারের ঝোঁক ছিল আমাদের দু-জনেরই। নাইরোবির বাইরে তখন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কণ্টক ও সিমোসা গাছের বনে জেব্রা, সিংহ, জিরাফ, উটপাখীর দল বিচরণ করতো, এখনও করে। আমরা কতবার এই সব অঞ্চলে যেতাম বন্য জন্তু শিকারের জন্যে। একবার একদল সিংহের সামনে পড়েছিলাম—তার মধ্যে এক গর্ভবতী সিংহী ছিল, সে আমাদের প্রায় চোখের সামনে একটা ঝোপের আড়ালে তিন-চারটে শাবক প্রসব করেছিলো

—সুতরাং লেখাপড়া সেখানে তেমন হয় নি।

—আপনি ডাক্তার হয়েছিলেন কোথায় পড়াশুনা কোরে ?

—সে অনেক পরে। কলকাতায় ডাক্তারি পড়ি।

—কত বছর বয়সে কলকাতায় আসেন ?

—পঁচিশ বছর বয়সে।

—অত বছর বয়সে ডাক্তারি পড়লেন ? পাস করেছিলেন ?

—হোমিওপ্যাথিক কলেজে পড়ি, মাত্র তিন বছরের কোর্স ছিল তখন। তাতেই যথেষ্ট রোজগার করেছি বা এখনো করছি।

—ভাগ্যটা ভালো আপনার।

—আমি প্রথম প্র্যাকটিস করি ডার-এস-সালামে, তারপর মোম্বাসায়। ওখান থেকে বম্বে। বোম্বে থেকে কলকাতায় এলাম। পয়সা যা কিছু বেশি রোজগার করি, সবই ডার-এস-সালামে। আবার ইচ্ছে ছিল, সেখানে যাই, কিন্তু সেখানে আর সুবিধে হবে না। ম্যালান গবর্ণমেণ্টের আওতায় ও উৎসাহে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েচে, তাতে ভারতবাসীদের আর সেখানে হয়তো সুবিধে হবে না। ওরাই বেশি ডাকতো।

—কারা ?

—আফ্রিকানরা। ওদের মধ্যে অনেকে ভারতীয় মেয়ে বিয়ে করেছিল সে সময়। অনেক মেয়ে ভারতীয় স্বামী গ্রহণ

করেছিল। আস্তে আস্তে উভয় সমাজে এ প্রথাটা চালু হচ্ছিল।

—এইবার আসল গল্পটা বলুন।

—বেলা গিয়েচে। বাকিটুকু অথবা আসলটুকু অতি অল্প, কিন্তু ভারি অদ্ভুত। শুনলেই তো ফুরিয়ে যাবে। তার চেয়ে চলুন চা খাওয়া সেরে নেওয়া যাক।

চা খাওয়া হলো খুব ভাল। ও-বেলাও যাতে আমি থাকি, সেজন্যে প্রণববাবু ও তাঁর স্ত্রী পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।—এবেলা নাকি ভালো করে খাওয়ানো হোল না।—আমার খাওয়ার নাকি খুবই কষ্ট হোল।

সন্ধ্যার পর আধ-জ্যোৎস্না আধ-অন্ধকারের মধ্যে প্রণববাবু আবার গল্প শুরু করলেন সেই হর্তুকিতলায় বসে।

এইবার যে কথাটা বলবো, সেটা ভালো করে বুঝতে হোলে আমার মামার বাড়ির ইতিহাস আপনার কিছু জানা দরকার। আমার দাদামশায় গোবিন্দ ঘোষাল সিপাই বিদ্রোহের সময় ফয়জাবাদ মিলিটারি একাউণ্টেণ্টে কাজ করতেন। তাঁর দুই বিবাহ, আমার দিদিমাকে তিনি বিবাহ করেন যখন, তখন তাঁর বড় ছেলের বয়েস ত্রিশ বছর।

টান

আমার মা তাঁর শেষ বয়সের সন্তান ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমার সে দিদিমা সধবা অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। আমার মাকে মানুষ করে বামা বলে এক পুরোনো ঝি, আমার মামার বাড়ির। আমার দাদামশায় তখন চাকরি থেকে অবসর নিয়ে হুগলী জেলায় নিজের গ্রামে এসে বসেচেন।

বামা মাকে ঠিক নিজের সন্তানের মত মানুষ করেছিল। বাইরে কোথাও গেলে সন্ধ্যার পর পিছু-পিছু যেতো মার বড় বয়সেও।

বামা কোথাও যেতো না, নিজের দেশ বর্ধমান জেলার যে ক্ষুদ্র গ্রামটিতে তার পৈতৃক ভিটে, মার ভার নেওয়ার পর-থেকে সে কখনো আর গ্রামে পদার্পণ করে নি।

আমার মা যখন বিয়ের কনে সেজে আমাদের বাড়ি এসেছিলেন—বামা তখন মার সঙ্গে এ বাড়ি চলে আসে এবং মাঝে-মাঝে দেশে চলে গেলেও প্রায়ই তার এই জামাই-বাড়ি এসেই থাকতো।

মা বলতেন—এখানেই থাক না কেন বামা ?

সে বলতো—না খেঁদি (মার ডাক নাম) জামাই-বাড়ি কি থাকতে আছে ? লজ্জার কথা।

সে কিন্তু মাকে ছেড়ে বেশিদিন থাকতে পারতো না—কিছু দিন পর-পর প্রায়ই আসতো। আসবার সময়, মা যা খেতে

ভালবাসতেন ছেলেবেলায়—নারকোল নাড়ু, চিঁড়ে, কলা, এই সব যোগাড় করে নিয়ে আসতো। শুধুহাতে কখনো আসে নি।

বামা কিন্তু মারা যায় আমার মামার বাড়িতেই হঠাৎ কি একটা অসুখ হয়ে। মার সঙ্গে দেখা হয় নি। মার সেজন্যে খুব দুঃখ হয়েছিল। আমাদের কাছে পর্যন্ত বামার নাম করতেন আর চোখের জল ফেলতেন।

আমি বললাম—আপনি বামাকে দেখেছিলেন ?

—না, আমার দাদা দেখেছিলেন, তখন দাদার ছ-সাত বছর বয়েস।

—তারপর ?

—তারপর কর্ম উপলক্ষে বাবা-মা উগাণ্ডা চলে গেলেন এবং সে দেশেই বাস করতে লাগলেন। আমরাও গেলাম, ক্রমে বড় হলাম সে দেশে। বাবার চাকরির উন্নতি হোল। আমার এক বোনের বিয়ে হোল মোম্বাসায়, সেখানে হুগলী জেলার বন্দীপুরের রামতারণ চক্রবর্তী শিপিং কোম্পানীর অফিসে চাকরি করতেন, তাঁর বড় ছেলে শিবনাথ আমার ভগ্নীপতি।

পরের বৎসর আমার মা মারা গেলেন।

আমার বোনের বিয়ের আগে থেকেই তিনি হৃদরোগে কষ্ট

পাচ্ছিলেন, একদিন সন্ধ্যার পর আমাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে বললেন শরীরটা কেমন করচে।

তারপর ঘরের মধ্যে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন, ডাক্তার আসবার আগেই মারা গেলেন।

এইবার আসল কথাটা এসে গিয়েছে।

মা তো মারা গেলেন সন্ধ্যার সময়। অনেক রাতে লোকজন যোগাড় হোল। যে কটি বাঙালী পরিবার নাইরোবিতে সে সময় থাকতো, তাদের সকলের বাড়ি থেকেই মেয়েরা ও পুরুষেরা এলেন সে রাত্রে আমাদের বাড়ি খবর পেয়ে। রাত এগারোটার পর আমরা শ্মশানে মৃতদেহ নিয়ে গেলাম।

নাইরোবির বাইরে শহর থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গায় নদীর ধারে শ্মশান। স্থানটা বড় নির্জন ও ঘাসের জঙ্গলে ভরা। রাত্রে এ-সব স্থানে সিংহের ভয় ছিল খুব বেশি। সিংহের উপদ্রবে রাতে কেউ বড় একটা মড়া নিয়ে যেতে সাহস করতো না শ্মশানে। আমাদের সঙ্গে অনেক লোক ছিল। আলো জ্বেলে ও বন্দুক নিয়ে আমাদের দল মৃতদেহ বহন করে শ্মশানে নিয়ে গেল।

মৃতদেহ চিতায় চড়ানো হয়েচে, দাদা মুখাগ্নি করলেন, আমরা

সবাই চিতার অদূরে বসে আছি। এমন সময় আমার ছোট ভাই দেবু আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ঐ দেখো, ও কে দাদা!

আমি চেয়ে দেখলাম। শ্মশানের দক্ষিণ দিকে একটা গাছ-তলায় একজন ভারতীয় বৃদ্ধা মহিলা চুপ করে বসে একদৃষ্টে চিতার দিকে চেয়ে আছে। পরণে তার আধময়লা থান কাপড়।

বাবা সেদিকে চেয়ে বলে উঠলেন—সর্বনাশ। ও যে বামা ঝি।

দাদা বললেন—হ্যাঁ বাবা, বামা দিদিমার মত দেখতে বটে।

বাবা বললেন—তোর মনে আছে?

—একটু একটু মনে পড়ে বাবা।

আমরা সবাই অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে রইলাম। সত্যি, এই গভীর রাতে এই দুর্গম শ্বাপদসঙ্কুল শ্মশান-ভূমিতে কোন বাঙালীর মেয়ে আসবার কথা কেউ কল্পনা করতে পারে না। আমরা কেউ তাকে চিনিও না। কেবল চেনেন বাবা এবং সামান্য কিছু চেনে দাদা। তাদের সাক্ষ্য সেখানে সেদিন গভীর এক তত্ত্বের অবতারণা করলে। কোথায় বা চিতা, কার বা মৃতদেহ, মৃত্যুই বা কার?

বৃক্ষতলে উপবিষ্টা নারীমূর্তি কিন্তু আমাদের দিকে লক্ষ্য

করে নি। সে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ, উদাসীনভাবে একদৃষ্টে জ্বলন্ত চিতার দিকে চেয়ে বসে ছিল। এখনো সে ছবি আমি দেখচি যেন চোখের সামনে। চিরকাল আঁকা থাকবে সে ছবি আমার মনের পটে।

হুগলী জেলার এক অখ্যাত গ্রাম থেকে মৃত্যুজয়ী স্নেহের টানে আজ বিশ বছর পরে বামা ঝি চলে এল পূর্ব আফ্রিকার নাইরোবির শ্মশান ভূমিতে।

বেশিক্ষণ আমরা দেখিতে পাই নি। সবসুদ্ধ বোধ হয় মিনিট পাঁচ-ছয় হবে বামা ঝিকে আমরা দেখতে পেয়েছিলুম সবাই মিলে। তার পরই মিলিয়ে গেল সে মূর্তি।

আমরা বেশি কিছু কথা বলি নি এর পর। দাহ কার্য শেষ করতে সকাল হয়ে গেল। নদীতে স্নান করে আমরা বাড়ি ফিরে এলুম তখন বেলা সাতটা সাড়ে সাতটা। ওই নদী তীরেই আমার মার দশপিণ্ড দেওয়া হয় এর দশদিন পরে এবং মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন রেল অফিসের অবিনাশ গাঙ্গুলী, নাইরোবির বাঙালীদের বাড়ির মোটামুটি বিয়ে পৈতে ষষ্ঠীপুজো তিনিই করতেন। তাঁর নামই ছিল আমাদের মধ্যে 'পুরুত-কাকা।'

নদীর ওপারে শৈলশ্রেণী সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢেকে গেল।

চালারাম

চ্যালারাম

দিল্লীর এক পার্কে চ্যালারামের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। ভীষণ জোয়ান, পুরো ছ-ফুট ছ-ইঞ্চি লম্বা, হাতের কব্জি এই মোটা, এই গোঁফ দাড়ি। এই বুকের ছাতি। কথায়-কথায় জানতে দেরী হোল না যে চ্যালারাম একজন অসাধারণ লোক। তাঁর মুখের ভাব এমনি যে, দেখলে মনে হয়, জীবনের অনেকখানি এ দেখেচে। এমন ব্যাপার ঘটেচে এর জীবনে, যা সচরাচর মানুষের জীবনে ঘটতে দেখা যায় না।

তার ওপর মুশকিল হয়েচে আমরা বাঙালী, আমাদের জীবনে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র এত সঙ্কীর্ণ! তবুও অমৃতসরে, দিল্লীতে, করাচীতে, ডেরাগাজিখাঁতে যারা জন্মায়—তারা অনেক কিছু দেখে অনেক কিছু করে। আমরা যারা খুব কিছু করি, বাপের পয়সার-খই ছড়াতে ছড়াতে বিলেতে গিয়ে উঠি। আমাদের চেয়ে মাদ্রাজী, তেলেগু, নোয়াখালি ও চাটগাঁয়ের মুসলমানেরা ভালো—তারা তবুও পাঁচটা দেশ দেখে, জাহাজের খালাসী-টালাসী হয়, যা হোক তবুও কিছু।

চ্যালারাম আমার কৌতূহল আকৃষ্ট করবে বেশী কথা নয়,

যখন সে প্রথমেই বললে সে ফ্রান্সে গিয়েছিল যুদ্ধের সময়, যুদ্ধ শেষ হবার পরে সে আবার একটা কিসে ভর্তি হয়ে মেসোপটেমিয়ায় যায়। মরুভূমিতে আরবদের হাতে পড়েছিল, টাইগ্রিসে নৌকোর বাচ খেলে এসেছে। বেবিলনের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসে চুরোট খেয়েচে।

আমি বললুম—তোমার জীবনে সকলের চেয়ে একটা বড় ঘটনার কথা বলো না, শুনি।

চ্যালারাম বলতে আরম্ভ করলে—

অমৃতসর জেলায় আমার বাড়ি। আমাদের গ্রামে সবাই এমন গরীব যে একজন একুশ টাকা মাইনে পেতো কলকাতায় কি কাজ করে—গ্রামের মধ্যে সেই ছিল বড় লোক ও বড় চাকরে। সে বলতো কলকাতায় সে পুলিশের দারোগা।

আমার স্বভাব ছিল হুঁদে ও নির্ভীক। আঠারো বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে দিয়ে কিছু টাকা যোগাড় করে কলকাতায় এলাম। ভাবলাম, পুলিশের দারোগা যদি হঠাৎ না হতে পারি, হেড কনস্টেবল হওয়া কে আটকাবে?

কলকাতা এসেই ভুল ভেঙে গেল। গ্রামের সেই লোকটাকে খুঁজে বার করে দেখলাম সে এক বড়লোকের বাড়ির

দরোয়ান। সে আমার কলকাতায় থাকবার একমাসের খরচ দিতে চাইলে, যদি কাউকে গাঁয়ে ফিরে তার দরওয়ানী করার কথাটা বলে না বেড়াই। তারই পরামর্শে মোটর গাড়ির কাজ শিখলাম। কিছুদিন কলকাতায় মোটর চালাবার পরে ইউরোপের মহাযুদ্ধ বাধলো। আমি সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে করাচী ও সেখান থেকে গেলুম ফ্রান্সে। এ সব দিনের অভিজ্ঞতা খুব বিচিত্র হোলেও বিস্তৃত বর্ণনা করবার দরকার নেই। যুদ্ধ শেষ হবার পরে গ্রামে ফিরে গেলাম, কিন্তু বেশীদিন ভাল লাগলো না। আবার একটা চাকরিতে ভর্তি হয়ে চলে গেলুম মেসোপটেমিয়া। তিন বছর পরে মেসোপটেমিয়া থেকে ফিরে বম্বে এলাম। হাতে তখন কিছু টাকা হয়েচে, ভাবলাম একটা ট্যাক্সি গাড়ি কিনে বম্বে কি কলকাতায় রাস্তায় চালাবো। কিন্তু দু-তিন দিন পরে একটা সরাইখানায় জন কয়েক পাঠান গুণ্ডার সঙ্গে একটা ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া বেধে ছুরি মারামারি হোল। আর একজন পাঠান জখম হোল। আমার সঙ্গে আমার এক বন্ধু ছিল। পুলিশের ভয়ে দু-জনে রাতারাতি বম্বে ছেড়ে চম্পট দিলাম।

অনেক বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হয়ে দু-জনে আমরা কোয়েটা হয়ে মরুভূমির পথে কাবুল পৌঁছে গেলাম। তখন নতুন

বাস ও লরি চলচে কাবুলে, অনেক বড় লোকের মোটর হয়েচে। কিন্তু ভালো মোটর ড্রাইভারের সংখ্যা ততবেশী নয়। আমাদের মোটর চালানোর কাজ পেতে দেরী হোল না।

কয়েক বছর কেটে গেল। বেশ সুখেই আছি! আগে হাতে পয়সা ছিল, সেই পয়সায় নিজে একটা লরি কিনে কাবুল কান্দাহারের পথে চালাই। জিনিসপত্র সস্তা, অনেক বন্ধু-বান্ধবও জুটে গেল, লরি চালিয়ে ক্রমশঃ উন্নতি হতে লাগলো। কাবুলে ভোলানাথ বলে একজন লোক ছিল, বিখ্যাত লোক। সে জাতে গুজরাটী ব্রাহ্মণ, অনেক দিন থেকে কাবুলে আছে। এখানে পুরুতের কাজ করে। মীরমক্দ্ বাজারের দক্ষিণে ছোট একটা গলির মধ্যে তার একটা ছোট মন্দির আর বাড়ি।

ভোলানাথের মন্দিরটি এক অদ্ভুত জায়গা।

সন্ধ্যার পর থেকে নানা ধরনের লোক সেখানে এসে আড্ডা দিতে আরম্ভ করে। চা হরদম চলচে, মোটা কড়া তামাকের ধোঁয়ায় মন্দিরের চাতাল অন্ধকার হয়ে যায়। এদিকে ঘণ্টা বাজে, আরতি হয়, প্রসাদ বিতরণ হয়। রাত বারোটা

একটা পর্যন্ত লোকের পর লোক আসচে। তার মধ্যে খুব বড় প্রতিপত্তিশালী ব্যবসাদার থেকে আমার মত বাজে লোকও আছে। আর সবারই ওপর ভোলানাথের প্রভাব খুব বেশী। সবাই তাকে মানে, খাতির করে, তার কাছে পরামর্শ নেয়।

একদিন রাত আটটার সময়ে ভোলানাথের মন্দিরে গিয়েচি।

চা পান শেষ হয়ে গিয়েচে। ভোলানাথ আমায় বললে—চা খাবে নাকি?

বললাম—থাক, রাত হয়েছে এখন আর চা খাবো না।

হঠাৎ আমার নজর পড়লো দলের মধ্যে একজন আফগান রাজকর্মচারী বসে। আমি তাঁকে অনেকবার পথে ঘাটে মোটর হাঁকিয়ে যেতে দেখেচি। অত বড় লোককে এখানে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু মুখে কোনো কথা কাউকে বলা উচিত বিবেচনা না করে চুপ করে রইলাম।

একটু পরে আফগান অফিসারটি চলে গেলেন।

শুনলাম আমাদের মধ্যে কে কে মেসিনগান চালাতে জানে আফগান অফিসার তাই জিগ্যেস করতে এসেছিলেন।

—ব্যাপার কি? মেসিনগান কি হবে? লড়াই কোথায়?

অনেক রাত্রে উঠে আসচি, আমার এক বিশেষ বন্ধু জোয়ালা-প্রসাদ আমায় চুপি চুপি বললে—টাকাকড়ি যদি ব্যাঙ্কে থাকে, উঠিয়ে নাও এই বেলা—

অবাক হয়ে বললাম—কেন, কি হয়েচে ?

—আমানুল্লার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হবে শীগগির।

—কে বিদ্রোহ করবে।

—আমার কাছে অত খবর তো পৌঁছায় নি। তুমি নিজে সাবধান হও, মিটে গেল। দু-একদিনের মধ্যে আগুন জ্বলবে। বেশী রাতে রাস্তায় চলাফেরা কোরো না।

মীরমক্‌দ্ বাজারের নীচ শ্রেণীর কাফিখানাগুলোতে তখনও আমোদ-প্রমোদ চলচে। এ সবগুলো ভয়ানক জায়গা রাতে। ব্যক্তিগত. অভিজ্ঞতা থেকে জানি, বেখাপ্পায় ছোরার ঘায়ে কত লোক যে প্রাণ হারিয়েচে তার ঠিকানা নেই।

বাজার ছাড়িয়েচি, এমন সময় হঠাৎ দূরে দুমদাম বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে পট্-পট্-পট্-পট্ মেশিন গানের আওয়াজ।

বাচ্চা-ই-সাকোর বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে গেল।

মীরমক্‌দ্ বাজারের লোকজন হুড় হুড় করে দোকান কাফিখানা ছেড়ে বার হয়ে এল, কেউ কিছু জানে না, সবাই কানখাড়া করে শুনচে।...

বিদ্রোহ কথাটা কিন্তু শীগগির তুলোর আগুনের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। সবাই সন্ত্রস্ত, ভীত হয়ে উঠলো—বিদ্রোহ মানে খুন, মানে লুটপাট, মানে গৃহদাহ, মানে পৈশাচিক অরাজকতা ও নিষ্ঠুরতা। বিশেষতঃ এই সব জায়গায়।

ঠিক তাই ঘটল। বাচ্চা-ই-সাকোর বিদ্রোহ যখন পুরোমাত্রায় চলেচে, তখনকার কথা সবই জানি, কিন্তু সে সব কথা বলবো না। চোখের সামনে যে সব ব্যাপার দেখেচি, এতদিন পরেও সে কথা ভাবলে শরীর শিউরে ওঠে। মীরমকদ্ বাজারে রক্তের স্রোত বইল। কে যে কাকে মারে, তার ঠিকানা নেই কিছু। সুযোগ পেয়ে বদ্‌মাইস খুনী গুণ্ডার দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠেচে—বাচ্চা-ই-সাকোর সৈন্যেরা করেচে রাজনৈতিক বিদ্রোহ—সুবিধা পেয়ে শহরের সাধারণ গুণ্ডা ও দস্যুর দল দিন-দুপুরে খুন রাহাজানি শুরু করে দিলে। আরও কত কি করলে, তার আর উল্লেখ না করাই ভালো।

একদিন রাত্রে আমার বন্ধু জোয়ালাপ্রসাদ এসে আমায় বললে—চুপি চুপি উঠে এসো ভোলানাথের ডেরায়—কোনো কথা জিগ্যেস কোরো না।

মীরমকদ্ বাজার পার হবার সময়ে তার অন্ধকার চেহারা

দেখে মনটা দমে গেল। ভোলানাথের মন্দিরে গিয়ে দেখি শিখ ও জাঠ যে ক-জন ড্রাইভার কাবুলে উপস্থিত ছিল, সবাই জড় হয়েচে—[illegible] সবসুদ্ধু। আর উপস্থিত আছেন সেই আফগান অফিসার আর তার সঙ্গে আর একজন দীর্ঘকায় সুপুরুষ আফগান, সাহেবী পোশাক পরা। মন্দিরের অস্পষ্ট আলোয় ওদের মুখ ভাল দেখা যায় না।

আফগান সর্দার বললেন—তোমাদের মধ্যে কে কে এই রাত্রেই কাবুল থেকে কান্দাহারের পথে মোটর নিয়ে যেতে পারবে? সেখান থেকে কে কে বোম্বাই পৌঁছুতে পারবে?

আমি তো অবাক। কোথায় কান্দাহার, আর কোথায় বোম্বাই। তাছাড়া যাবার পথ কৈ?

বিদ্রোহীরা তো খাইবারের পথ আটকেচে। আপাততঃ কাবুল নদী পেরুনো যাবে কিনা সন্দেহ। কেন, কাকে নিয়ে যেতে হবে?

আফগান অফিসার বললেন—চামানের পথে কোয়েটা হয়ে বোম্বাই পৌঁছুতে হবে। দশখানা লরি চাই। প্রাইভেট মোটর দু-খানা থাকবে। তা চালাবার লোক চাই। যত টাকা চাও পাবে।

আমরা সবাই ঘাড় নাড়লুম। অসম্ভব। চামানের পথে কোয়েটা হয়ে বোম্বাই। এই ভীষণ দিনে।

আফগান অফিসারটি অনেকক্ষণ তর্কবিতর্ক করলেন, ভয়ও দেখালেন—কোনো ফল হোলো না।

এমন সময় সাহেবী পোশাক পরা সেই সুপুরুষ লোকটি অন্ধকারের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—কেন, তোমাদের আপত্তিটা কি?

আমার ডাইনে বাঁয়ের দু-তিন জন শিখ ও জাঠ চমকে উঠেই আভূমি নত হয়ে কুর্ণিশ করলে। জোয়ালাপ্রসাদ বিস্ময়ে কাঠ হয়ে কলের পুতুলের মত বলে উঠল—জাঁহাপনা!... আমিও তখন চিনলাম। কি সর্বনাশ! স্বয়ং রাজা আমানুল্লা।

আমানুল্লা বললেন—শোনো। যা চাও তাই পাবে। আমার দশখানা লরি দরকার। কে কে রাজি আছ? আমাকে বোম্বাই পৌঁছে দিতে হবে। বড় বিপদে পড়ে তোমাদের ডেকেচি। তোমাদের বিশ্বাস করতে পারি?

আমরা সমস্বরে বলে উঠলুম—জান কবুল, হুজুরালি—আমরা তৈয়ার। হুকুম করুন কোথায় গাড়ি আনতে হবে।

আমানুল্লা রিস্টওয়াচে সময় দেখে বললেন—একঘণ্টার মধ্যে গাড়ি এইখানে নিয়ে এসো। তারপর কোথায় যেতে হবে ইনি বলে দেবেন।

সেই রাত্রে দশখানা লরি ও দু-খানা প্রাইভেট মোটর চুপি

চুপি কাবুল ছেড়ে কান্দাহারের পথে রওনা হোল। চারখানা লরিতে বোঝাই হোল শুধু টাকা—তামার চওড়া পাতে আঁটা কাঠের ভারী বাক্স বোঝাই নগদ টাকা। প্রাইভেট মোটর দু-খানায় রাজা, রানী, ছেলেমেয়ে। সামনে পেছনে দু-খানা লরিতে তেরপল চাপা মেসিনগান।

শেষ রাত্রে কুয়াশার মধ্যে কাবুলের নিঃশব্দ রাজপথ দিয়ে দেশের রাজা রানীকে নিয়ে আমরা তীরের বেগে গাড়ি উড়িয়ে দিলাম।

কাবুল নদী পেরিয়ে একটা ছোট পাহাড়ের ওপর বিদ্রোহীদের একটা ঘাঁটি। এতগুলো গাড়ি গেলে নিশ্চয়ই ওরা সন্দেহ করে পথ আটকাবে। জাঠ পূরণমল মেসিন গানের পেছনে তৈরী হয়ে বসলো। আমরা কি করবো ভাবচি—স্বয়ং আমানুল্লা হুকুম দিলেন কেটে বেরিয়ে চলো—

গম্বুজের কাছে ওরা অনেকে জড় হয়েচে দূর থেকে দেখতে পাচ্চি। আমরা এ্যাকসিলারেটরে পা দিয়ে সজোরে চাপলাম—চালাও! হু হু করে স্পিডোমিটারে ত্রিশ মাইল থেকে ঠেলে উঠল চল্লিশ…পঞ্চাশ—চক্ষের নিমেষে ওদের ঘাঁটিটা একটা রাঙা কালো আবছায়ার মত পাশ দিয়ে উড়ে বেরিয়ে গেল—দুমদাম রাইফেল চললো…পট্‌পট্‌ মেসিনগান উত্তর দিলে আমাদের দিক থেকে। একখানা

টাকা বোঝাই লরি টায়ার ফেটে অচল হয়ে পড়লো। রইলো সেটা পড়েই—কেউ তার দিকে চাইলাম না।

পেছনে ওরা এবার তাড়া করবে নিশ্চয়ই। আমাদের সময় ছিল না; কান্দাহারে খবর পেলাম, কোয়েটা যাবার পথ বিদ্রোহীরা আটকেছে। ঘুরে হেলমন্দ নদী পার হয়ে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে আমরা আফগানিস্থানের সীমানা পার হই। তারপর বেলুচিস্তানের দুর্গম মরুভূমি···কালো কালো গাছপালাহীন পাহাড় আর কাঁটা বালির মরুভূমি···মরুভূমি আর পাহাড়।

এই মরুভূমির মধ্যে কালাত থেকে চামানের পথে বেলুচ দস্যুরা আমাদের আক্রমণ করলে, ভাবলে লরি বোঝাই সওদাগরী মাল যাচ্চে। মেসিনগান খেয়ে হটে গেল। একবার জল গেল ফুরিয়ে। এঞ্জিনের ট্যাঙ্কের গরম জল রাজা রানীকে খেতে দিলাম নিজেদের বঞ্চিত করে। হয়তো সেবার সবসুদ্ধ মরতে হোত মরুভূমির মধ্যে; কারণ ঠিক সেই সময় বেজায় বালির ঝড় উঠলো। রাস্তা নেই, দিক মুছে গেল, তার ওপর মুশকিল একখানা সেলুন গাড়ির এঞ্জিন অকর্মণ্য হয়ে পড়লো, কি যে সেটার ঘটল, কিছুতেই আমরা তা ধরতে পারলাম না। বাকী গাড়িখানায় ঐ গাড়ির ছেলেমেয়েদের তুলে দিলাম—সেই ভীষণ গরমে,

তৃষ্ণায় আর ঠাসাঠাসিতে তাদের কি কষ্ট! একেবারে নেতিয়ে পড়লো গাড়ির মধ্যে। আমানুল্লা নেমে এসে লরিতে ড্রাইভারের পাশে বসলেন। সৌভাগ্যক্রমে ঘণ্টা-দুইয়ের মধ্যে কালাত থেকে করাচীগামী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ডাক মোটরের সঙ্গে আমাদের দেখা হোল। ডাক পাহারা দেবার জন্যে সঙ্গে একখানা সাঁজোয়া গাড়ি, কারণ ঐ সময়টা বেলুচ দস্যুদের বড় উৎপাত চলছিল মরুভূমির পথে। একদিনে চামান, পরদিন দুপুরে করাচী। ঠিক হোল সেখান থেকে ট্রেনে রাজা রানী বম্বেতে যাবেন। আমরা ফিরলাম সেইদিনেই কাবুলে। জনপিছু দুশো টাকা বকসিস মিললো, গাড়িভাড়া ও তেলের দাম বাদে। বিদায় নেবার সময় আমানুল্লা আমাদের প্রত্যেকের করমর্দন করলেন। বললেন—যদি কখনও ফিরি, তোমাদের ভুলবো না। চেয়ে দেখি রানীমার চোখে জল। আমাদেরও কারো চোখ সে সময় শুষ্ক ছিল না, বোধহয় কঠোর প্রাণ দুর্ধর্ষ জাঠ পূরণমলেরও না—নইলে সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছিল কেন?

সাড়না

সান্ত্বনা

গরুর গাড়ি চন্দনপুর গাঁয়ের কাছে আসতেই ননীবালা বললে—ভাখ খোকা, আমরা এসে গিইচি।

—আমি দেখচি মা, ঘুমুই নি।

—এখান থেকেই গাঁ আরম্ভ হয়েচে—ঐ যে জেলেপাড়া—

—বামুনপাড়া কদ্দূরে মা?

—একটু আগে।

ননীবালা বিষম উত্তেজিত হয়ে উঠেচে। একটা অজ্ঞাত আবেগ বুকের মধ্যে ঠেলে উঠচে তার। তার মনে পড়ল প্রায় ত্রিশ বছর আগে সে এই গাঁয়ে নতুন-বৌ হয়ে প্রবেশ করেছিল। তখন সে ছিল তার সঙ্গে, যেমন সুরেশ আজ তার সঙ্গে রয়েচে—সেই মুখ, সেই চোখ, বয়সও প্রায় কাছাকাছি……

যখন তারা পাড়ার মধ্যে এসে ঢুকল তখন সকাল হয়েচে, কাক ডাকচে কা-কা করে। সুরেশ গাড়ি থেকে নেমে গাঁয়ের ধুলো নিয়ে কপালে ঠেকাল, তারপর মাকে জিগ্যেস করলে—কদ্দিন আগে তুমি গাঁ ছেড়ে গিয়েছিলে?

—তোর যত বয়স—ঠিক তত বছর আগে।

—একুশ বছর আগে ?

—হ্যাঁ। ওনার ইস্কুলের চাকরি যাবার পরেই আমরা গাঁ ছেড়ে চলে যাই।

—বাবা দুঃখ পান নি ?

—তা আর পায় নি। শেষের দিকে প্রায়ই বলত—গাঁয়ে ফিরে যেতে পারলে আমি বোধ হয় আর কটা দিন বেশি বাঁচতুম। গাঁয়ের মেয়েরা বসে বসে এই সময় নিশ্চয় বসন্তের রোদ পোহাচ্চে আর কুল শুকোচ্চে, বাঁশঝাড়ে বাঁশঝাড়ে কোকিল পাপিয়া ডাকচে—উঃ, কোন রকমে যদি গাঁয়ে ফেরা যেত…। শহরের ছোট্ট ঐটুকু বাড়িতে গরমে একেবারে অস্থির হয়ে পড়ত।

—আমি যদি তখন বড় হতুম, মা, তা হলে বাবাকে নিশ্চয়ই গাঁয়ে নিয়ে আসতুম।

সুরেশ একহারা গড়নের শক্তসমর্থ ছোকরা। সে ফুটবল খেলে, দেশ স্বাধীন হবার পরে রাইফেল ক্লাবে বন্দুক ছোড়া শিখচে। রেলের চাকরিতে অ্যাপ্রেন্টিস হয়ে ঢুকেচে, এ বছরে সেটা শেষ হলে ভাল চাকরি পাবে। এরই মধ্যে রেলওয়ে কলোনীর ওপরওলা অনেক অফিসারের

সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েচে ভাল ফুটবল খেলতে পারার জন্যে। কাজকর্মেও তার খুব মন, এ ছাড়া অঙ্কের টিউশনি করে প্রতি মাসে সত্তর-আশি টাকা রোজগার করে।

দশ বছর আগে নলিনীবালার স্বামী মারা গিয়েচে। সুরেশ তখনই স্কুলে পড়ত। যে কষ্টের মধ্য দিয়ে তাদের দিন কেটেচে—সে স্বপ্নেও ভাবে নি যে, ও আঘাত তারা কোন দিন সামলে উঠতে পারবে। কিন্তু রেলের কলোনীর সকলেই যথেষ্ট সাহায্য করেচে। তারাই একটা বাসা ঠিক করে দিয়েছিল, কারণ রেলের কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হল। রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের সেক্রেটারী রায়বাহাতুর হরিচরণ বসু নিজে এসে তাদের খোঁজ-খবর নিয়ে যেতেন। ইনস্টিটিউটের ট্রাস্টীরা সুরেশের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং এই অনাথ পরিবারকে অনশনের হাত থেকেও বাঁচিয়ে রাখলেন।

আজ মনে হচ্চে অকূল সমুদ্রে সে কূলের আভাস দেখতে পাচ্চে। সকলেই বলচে যে দেশ স্বাধীন হয়েচে, তখন এবার সব দুঃখকষ্ট ঘুচল, ছেলেরা ভাল ভাল কাজ পাবে আর তাড়াতাড়ি উন্নতি হবে—সামান্য কটা টাকার জন্যে আর জীবন পাত করতে হবে না। স্বাধীন পৃথিবীতে আর কেউ ক্ষুধার্ত থাকবে না—অনেক বড় বড় কাজ হবে—

চারিদিকেই সভা-সমিতি ও বক্তৃতার ধুম পড়ে গেচে। কয়েক দিন আগেও সকলে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতি ফুলের মালায় সাজিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েচে। সেদিন তাঁর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী ছিল। মহাত্মা গান্ধীর খুব প্রিয় একটা গান, বোধ হয় 'রামধুন' সেটা সুরেশ খুব ভাল গায়—

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম
পতিত পাবন সীতারাম···



রোদ উঠেচে। সামনের পাকা বাড়িটা থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসে রাস্তায় মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাদের গরুর গাড়ির দিকে চেয়ে ছিল। ননীবালা ফিসফিস করে বললেন: সুরেশ, ঐ বোধ হয় তোর বিনোদ কাকা—ওঁর খুড়তুতো ভাই—হ্যাঁ, ঠিক তাই। তোর নাম বল গে যা, আর পা ছুঁয়ে প্রণাম করবি, ভুলিস নে যেন। আমাদের আসবার কথা উনি জানেন।

পরিচয়ের পালা চুকতে বেশ কিছুক্ষণ লাগল। বিনোদ কাকা ননীবালাকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

বহু বছর পরে কোনও বধূর গ্রামে ফেরা একটা মস্ত ঘটনা।

গ্রামের সমস্ত গিন্নী-বান্নী, বৌ-ঝির দল তাকে দেখতে এল। অভয় পরামানিকের বউ বললে—বৌমা ভাল ছিলে তোমরা? তোমার খোকা কোথায়? কত বড়টি হয়েচে দেখি! দাঁড়াও আগে তোমাকে পেন্নাম করি। প্রণাম সেরে সে বসল।

নাপিত-বৌকে দেখে ননীবালা অবাক হয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে একটা দুঃখের অনুভূতিও তার হল। অভয়ের বউ তার থেকে অন্ততঃ কুড়ি বছরের বড়—প্রায় তার মায়ের বয়সী। তার চুল পেকে গেচে, তবে অবস্থাপন্ন ঘরের বৌ হওয়ার জন্য তার বয়স তত বেশী দেখায় না। কিন্তু অভয়ের বৌ এখনও সিঁদুর পরে, অভয় এখনও বেঁচে আছে। অবশ্য এতে এমন অবাক হবার কিছু নেইও—যতই হোক সত্তরের বেশী বয়স হবে না, কিন্তু…

ননীবালা এই 'কিন্তু'র উত্তর খুঁজে পেল না। তার আর কি মৃত্যুর বয়স হয়েছিল! ননীবালা পর দিনে দেখতে পেল যে শুধু অভয়ের বউ নয়, তার থেকেও বেশি বয়সের স্ত্রীলোকেরা এখনও পাকা চুলে সিঁদুর পরচে। তবে কেবল সে-ই কেন তাকে এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে চলে গেল? গাঁয়ের মেয়েরা তাকে দেখতে এলে এই প্রশ্নই তার মনে থেকে-থেকে বাজতে লাগল।

ননীবালার শ্বশুরবাড়ি বিনোদ কাকার বাড়ির দক্ষিণে। একুশ বছরের অবহেলার চিহ্ন বাড়িটার সর্বদেহে প্রকট হয়ে রয়েচে, উঠোন ঘাস আর কাঁটা ঝোপে ভরে গিয়েচে, দেয়াল ফুঁড়ে একটা বন-ডুমুরের গাছ উঠেছিল—এখন তাতে ফল ধরেচে, কাঁটা লতায় আচ্ছন্ন জানলার পাল্লা প্রায় ঢাকা পড়েচে।

সুরেশ বলতে লাগল—মা, চল—আমরা নিজেদের বাড়িতে যাই। নিজের গাঁয়ে এসে অন্যের বাড়িতে থেকে লাভ কি? আগাছা পরিষ্কার করাতেই তিন দিন লেগে গেল। তারপরে একদিন ননীবালা বাড়িটি দেখতে গেল। এক সারিতে তিনটি ঘর, দু-দিকে বারান্দা, উঠোনের ওপারে রান্নাঘর ও ভাঁড়ার। কত দিন পরে সে এই ভিটেতে আবার পা ফেললে···দীর্ঘ একুশ বছর—আর তার মধ্যে কত কি ঘটে গিয়েচে।

সুরেশ বলে—এ বাড়িতে বাস করার কথা আমার একদম মনে নেই মা।

দূর বোকা—ননীবালা বকে তাকে—তুই তখন সবে ন মাসের, সেই সময়ে আমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাই।

—আমরা এখন এখানে কিছুদিন থাকব মা, জায়গাটা খুব ভাল লাগচে।

—সেই জন্যেই তো এসেচি খোকা, তারপর এখন মা-মঙ্গলচণ্ডীর ইচ্ছে।

ননীবালা সমস্তক্ষণ ধুলো ঝাড়া, পরিষ্কার করা ইত্যাদিতে ব্যস্ত রইল। একুশ বছরে ধুলোর স্তর পুরু হয়ে জমে রয়েচে! কিন্তু তার কেবলই মনে পড়চে তার স্বপ্নময় যৌবনের আনন্দোজ্জ্বল দিনরাত্রিগুলির কথা—'সে' তখন নবযুবক আর ননীবালা চৌদ্দ বছরের বালিকা মাত্র।
সুমুখেই সেই কুলুঙ্গিটা—'সে' একবার কিছু মিষ্টি এনে ওখানে লুকিয়ে রেখে তাকে কি বোকাটাই না বানিয়েছিল। কী একটা পেটেণ্ট ওষুধের লেবেল আঁটা পিজবোর্ডের বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রেখে তাকে জিগ্যেস করেছিল—'বল ত ওটার মধ্যে কি আছে!' ননীবালা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিয়েছিল—'তোমার সব জিনিসের খবর আমি রাখি বুঝি? কোনও বিদেশী ওষুধ-টোষুধ হবে আর কি?'
—বাজি রাখবে?
—ও সব আমি বুঝি নে। বাক্সে কি আছে তাই বল?
—রসগোল্লা।
—যাও যাও। রসগোল্লা না হাতি।

—তোমার দিব্যি, এই দেখ! কটা তুমি খেতে পার?
তারপরে তারা তু-জনে সেই মিষ্টি নিয়ে কি কাড়াকাড়ি লাগিয়েছিল···ত্রিশ বছর আগে—অথচ মনে হয় যেন গতকালের কথা। এই ঘরবাড়ি 'তার' স্মৃতিতে পরিপূর্ণ। প্রতিটি ঘর ও বারান্দা, গৃহের প্রতি কোণ, কাঠের চৌকি, রান্নাঘরে কাঠের পিঁড়ি, প্রতিটি ক্ষুদ্র বস্তু তার বধূজীবনের প্রথম দিকের স্মৃতিতে ওতপ্রোত হয়ে আছে। তার তরুণ স্বামী এ ঘর থেকে ও ঘরে ঘুরে বেড়াত, আর সে লজ্জারুণ চঞ্চল-হৃদয়া নববধূর মত তার অলক্ত-রঞ্জিত ব্যস্ত পায়ে-পাশে ঘুরত নানান কাজে।

ননীবালার মনে হতে লাগল যেন এখনই পাশের ঘরে গেলেই সে তার স্বামীকে কাঠের তক্তপোশে বসে আছে দেখতে পাবে। আবার ও ঘরে গেলে মনে হয় তার স্বামী এ ঘরে আছে। বিগত দিনের মত এখনও যেন তার স্বামীর সঙ্গে লুকোচুরির খেলা চলেচে···।
একদিন একগোছা নতুন ধানের শীষ নিয়ে এসে ওকে বলেছিলো—এগুলো মা-লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে তুলে রেখে দাও, এই প্রথম নতুন ধান উঠেচে। শাঁখ বাজাও, আমার

বাড়ির তুমিই হলে গৃহ-লক্ষ্মী—শাঁক বাজিয়ে বরণ করে তোল।

দ্বিপ্রহরের প্রখর তাপে নিমের অলস মধুগন্ধের সঙ্গে অজস্র পুরোনো স্মৃতি ভেসে আসচে, ননীবালা একদৃষ্টে বাঁশঝাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে, তার মন অতীতের আবেগজড়িত মুহূর্তের স্মৃতিমন্থনে ডুবে। এমনি কোন কোন মুহূর্তে সুরেশ ডেকে বলে—'মা এক গ্লাস জল দেবে?' সে চমকে ওঠে, বিক্ষিপ্ত কল্পনা টুটে যায়, পাছে সুরেশের কাছে তার মনোভাব ধরা পড়ে যায় এই ভেবে লজ্জিত হয়ে ওঠে।

সুরেশকে জল এনে দিয়ে সে তালির কাজে ব্যস্ত হয়ে ওঠে, অথবা বঁটি নিয়ে তেঁতুলের গাদা কুটতে বসে। তারপর আবার তার মন পুরোনো দিনের মধ্যে ফিরে যায়। একদিন সে উঠোনে একগাদা তেঁতুল নিয়ে এমনিভাবে কুটতে বসেছিল···

'সে' পা টিপে টিপে এসে পেছন থেকে ফিসফিস করে বলেছিল—'এসব বাজে কাজ রেখে দাও দিকি নি, লেবুর পাতা লঙ্কা আর নুন দিয়ে তেঁতুল মাখো বরং।'

'স্-স্ চুপ, মা শুনতে পাবেন। ও সব হবে না যাও—কাঁচা তেঁতুল খেয়ে জ্বর বাধাতে চাও বুঝি ?'

—'আহা-হা তুমি নিজে যেন খাবে না—আমি একলা সবটা খাব বলিচি না কি ? মা এখন অগাধে ঘুমোচ্চেন। লক্ষ্মীটি তাড়াতাড়ি কর। আচ্ছা, সত্যি করে বল তো, তেঁতুলের আচার খাবার কথায় তোমার জিভে জল আসচে কি না ?' শেষ পর্যন্ত তাই হল, ননীবালা রান্নাঘরের দিকে গেল। তার স্বামী বললে—'দাঁড়াও, আমি এখনি লেবুর পাতা নিয়ে আসচি। তেঁতুলগুলো ভাল করে ধুয়ে নাও, নইলে খেতে খারাপ লাগবে।'

—'আচ্ছা, আচ্ছা, সবজান্তা মশাই', ননীবালা রাগের ভান করে বলে—'তেঁতুল ধুলে নষ্ট হয়ে যায়, মাকে জিগ্যেস করে দেখো।'

দু-জনে মিলে সব তেঁতুল খেয়ে ফেললে। পরদিন তার স্বামীর গলাব্যথা আর সর্দি হল। ননীবালা তর্জনী তুলে শাসনের সুরে বললে—'আর তেঁতুল খাবে ? তখনি বলি নি আমি ? শুনলে না আমার কথা ! আমার মত লোকের কথা শুনবেই বা কেন ?'

—'মাকে বলো না যেন।'

—'একশো বার বলবো। তবে তোমার শিক্ষা হবে।'

তার পরে ভেংচি কেটে বললে—'লেবুর পাতা লঙ্কা দিয়ে আর একটু তেঁতুল খাবে?'

ননীবালার দু-চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। আঁচল দিয়ে সে তাড়াতাড়ি মুছে ফেললে—ছেলে যেন দেখতে না পায়। আজ যদি তার 'সে' বেঁচে থাকত! অসম্ভব কিছু নয়—কারণ, এখনও তার খুব বেশি বয়স হ'ত না। আজকের দিনটা তা হলে কী আশ্চর্য সুন্দরই না হয়ে উঠত—তার খোকা এখন পূর্ণবয়স্ক হয়ে উঠেচে, সকলেই বলে সে খুব ভাল ছেলে, মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় রেলের ভাল চাকরি পাবে শীগগিরই। তার স্বামী এখন ঘরে বসে পরিপূর্ণ বিশ্রাম উপভোগ করতে পারতো, কোনও কিছুর জন্য কেউ আর তাকে বিব্রত করতো না, ছেলের আয়ের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্তে দিন কেটে যেত···আজকের এই গুমোটে ঘরে বসে-বসে তাহলে সে কেবলই গল্প করতে পারত। সুরেশের বউ কাজকর্ম করতো, তাদের জন্য তেঁতুল মেখে নিয়ে আসতো। কিন্তু আজ পৃথিবীতে ননীবালা একা—তার স্বামী তাকে ছেড়ে আগেই চলে গেচে।

সান্ত্বনা

ননীবালার সম্মুখে এখনও পড়ে রয়েচে সুদীর্ঘ অস্পষ্ট পথ কতদিন তাকে এভাবে চলতে হবে তা কেউ জানে না… কিন্তু, না না, তার সুরেশ আছে। ভগবান তাকে বাঁচিয়ে রাখুন। ননীবালা তাকে বিয়ে দিয়ে ঘর-সংসার গুছিয়ে দিয়ে যাবে। এখনও সে ছেলেমানুষ, ঘরকন্নার কিছুই বোঝে না। তার ছেলেকে দেখাশুনো করার দায়িত্ব তারই।

হঠাৎ সুরেশ এসে বললে—মা লেবুর পাতা আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে একটু তেঁতুল মেখে দেবে?

ননীবালা চমকে উঠল। নির্বাক হয়ে সে চেয়ে রইল তার ছেলের মুখের দিকে, তার পরেই তার উদগত অশ্রু রোধ করার জন্য অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। অবিকল তার বাবার মত কথা বলতে সুরেশ শিখল কোথা থেকে? একই স্বর, একই সুরে কথা বলা…

গ্রামে ফিরে আসার পর থেকে সে অবিরত তার স্বামীর পদধ্বনি শুনচে; অন্যমনস্ক হয়ে পড়চে, সমস্ত কিছুই যেন তার কাছে অর্থহীন শূন্য খোলা বলে মনে হচ্ছিল।

*　　　*　　　*

সান্ত্বনা

একদিন গ্রামের হরিদাস চক্রবর্তী এসে গাঁয়ের সমস্ত মেয়েদের সত্যনারায়ণের পাঁচালী শুনবার ও প্রসাদ পাবার নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁর পাকা বাড়ির বারান্দায় পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। নিমন্ত্রিতা স্ত্রীলোকদের জন্য মাদুর বিছিয়ে দেওয়া হল, পুরুষেরা বাইরের চত্বরে বসল। পূর্ণচন্দ্রের আলোতে নারকেল গাছের ছায়া পড়েচে সেখানে। সদ্য তোলা যুঁই ফুলের সুগন্ধে সমস্ত বারান্দা আমোদিত হয়ে উঠেচে।

হরিদাসের স্ত্রী এগিয়ে এসে ননীবালাকে অভ্যর্থনা করলেন—এসো বোন। এসো এসো অনেকদিন পরে এখানে এলে—সেই অনন্ত চতুর্দশীর সময় আরেকবার এসেছিলে, মনে আছে?

ননীবালা বললে—খুব মনে আছে।

—তোমার বিয়ের বোধহয় এক বছর কি দু-বছর পরে।

—প্রায় দু-বছর।

—তোমার মুখ অনেক বদলে গেছে।

—মুখের কথা বলচ, দিদি—আর মুখ দিয়ে হবেই বা কি! সে সব তো অনেক আগেই চুকে গিয়েচে।

—সত্যি, ও কথা ভাবলে আমার ভারি কষ্ট হয় বোন, তার বয়সও তো বেশি হয় নি—আমার থেকে অনেক ছোট।

চলে যাবার বয়স তার হয় নি। কিন্তু বরাত তো কারো কথা মেনে চলে না, কি আর করবে বল—

ননীবালার দু-চোখ জলে ভরে গেল। চোখের জলে যাতে মুখ ভেসে না যায় এজন্যে সে অশ্রু সংবরণের চেষ্টা করতে লাগল। এদের সামনে তার অশ্রু-বর্ষণ লজ্জাকর, তার বেদনা এরা বুঝবে না, কারণ এ ধরনের তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতা তাদের নেই, বিষয় ভোগে, আহারে-বিলাসে মগ্ন এরা—তার যে অভিজ্ঞতা তা এদের ধারণায় আসে না, এরা মনে করবে সে তার দুর্ভাগ্যকে এদের সামনে বেশী করে দেখাচ্চে।

প্রতিবেশী কানাই গাঙ্গুলীর পুত্রবধূ এসে তার পাশে বসল, তারা দু-জনে আলাপ করতে লাগল। তার বিয়ে বেশী দিন হয় নি—সবে ন-মাসের একটি মেয়ে কোলে। তার বাপের বাড়ি শান্তিপুরের কাছে হবিবপুরে, কথাবার্তায় বেশ একটু শহুরে টান আছে। সে বললে ক-দিন ধরেই ভাবচি, যাই কাকীমার সঙ্গে গিয়ে একটু দেখা করে আসি।

—সত্যি ? আমার কথা কে বললে ?

—সকলের কাছেই শুনচি। আমার শাশুড়ী বলেছিলেন যে গাঁয়ে এ পর্যন্ত আপনার মত বৌ একটাও আসে নি। আপনার সঙ্গে দেখা করতে বললেন। ভাল কথা—কাকীমা, আপনার নাম কি ?

—ননীবালা। তোমার ?

—প্রীতিলতা।

—সুন্দর নাম। খুকির নাম কি রেখেচ ?

—এখনও নাম রাখা হয় নি—সবাই টুনু বলে ডাকে। আপনাদের ওখানে বেড়াতে গেলে কিন্তু আপনার নাতনীর জন্য একটা নাম ঠিক করে দিতে হবে।

—নিশ্চয়ই। কালই এসো না। তুমি গান জান ?

—বিশেষ কিছু নয়। আমি বরং আপনার গান শুনবো। সবাই বলে আপনি খুব ভাল গান করতে পারেন।

—আমি ? আমার কি আর গান গাইবার দিন আছে মা ?

—কিন্তু না···এ তো চলবে না। এত সহজেই চোখে জল আসচে যে ননীবালা প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেচে। তার ছেলেও এখন বয়স্ক হয়ে উঠেচে। তা ছাড়া এক গাঁ লোকের সামনে অভিমানী মেয়ের মত অশ্রুপাত করা তার ভাল দেখায় না।

প্রীতিলতা দেখতে সুন্দর—বছর আঠারো বয়সের হবে। ননীবালা নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—এসো কিন্তু ঠিক। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবো—এই মনে করেই তো গাঁয়ে এসেচি। তোমার পথ চেয়ে থাকবো।

গোলমালটা হঠাৎ বেড়ে উঠলো। কথকতা বোধ হয় এইবার

শুরু হবে। এমনি সময়ে ননীবালার বয়সী আরেকটি মেয়ে এসে তার হাত ধরলে।

—বৌদি, আমাকে তোমার মনে আছে ভাই ?

—ননীবালার বেশ স্পষ্ট মনে আছে—এই গাঁয়েরই উপেন ভট্‌চাযের মেয়ে কনক। প্রথম যখন ননীবালা স্বামীর ঘর করতে এলো—তখন রায়চৌধুরীদের সুবাসিনী আর এই কনক তাদের দরজা-বন্ধ ঘরের সামনে এসে অর্ধেক রাত পর্যন্ত আড়ি পেতেচে। দু-জনের ধৈর্যও ছিল অসাধারণ। একদিন—কিন্তু না এখন সে ভুলে যাওয়াই ভাল—সে সব পাগল করা সুবাসস্নিগ্ধ দিন চলে গিয়েচে কবে—বিস্মৃতিতে ডুবে গিয়েচে। এত চেষ্টা করে সে যা প্রাণপণে ভুলে থাকতে চাইচে, এই বুদ্ধিহীনা স্ত্রীলোকের দল সেই বিষয়েই বারেবারে কথা তুলে তার স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলচে। অথচ ওরা এই সহজ সত্যটা বুঝচে না। অজস্র পুষ্পের সুরভিতে সুবাসিত সুদূর অতীতের দিন-রাত্রিগুলি কনকের উপস্থিতির সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা—সে তার সামনে না এলেই তো ভাল করত।

ননীবালা চেষ্টা করে মুখে হাসি টেনে আনলে, তারপর বললে—মনে আছে বৈকি, ভাই! তারপর, কেমন আছ ?

—এই একরকম। মনে আছে—একবার উঁকি মারবার জন্য

দাদা আমার মুখে কেমন চকখড়ির গুঁড়ো মাখিয়ে দিয়েছিলেন ?

এ ছাড়া কথা বলবার আর কি কোনও বিষয় নেই ?

ননীবালা চুপ করে থাকল। কনকও অপ্রতিভ হয়ে থেমে গেল। ইতিমধ্যে ভিড় বেড়ে উঠেচে। উঠোনে পাতার উপর প্রসাদ সাজানো হয়েচে। ননীবালারা তার পাশে গিয়ে বসল। পাঁচালী শুরু হল।

এই সময়ে একটি বৃদ্ধ লোক এক হাতে একটি ঘটি ও অন্য হাতে একটি লাঠি নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে উপস্থিত হলেন। এসেই জিগ্যেস করলেন—পাঁচালী শেষ হয়ে গেছে!

হরিদাস চক্রবর্তীর ছেলে বললে—এখনও হয় নি—কাকা, আসুন না বসবেন আসুন।

—না ; এখানে মেয়েদের মধ্যে আর বসবো না। আর কতক্ষণ চলবে ?

—আজ্ঞে, এই এক্ষুনি শেষ হবে।

—আমাকে ফিরে গিয়ে আবার রান্না করতে হবে। বেশি দেরি হবে না তো ?

ননীবালা তার পাশের একজনকে জিগ্যেস করলে—ইনি কে।

—চাটুয্যে মশায়। ছেলেরা কলকাতায় ভাল ভাল চাকরি করে। বাপকে দেখে না।

—বউ নেই বুঝি ?

—আছে বৈকি ! তিনি কলকাতায় ছেলেদের সঙ্গে থাকেন।

—তা হলে চাটুয্যে মশায় ওখানে গিয়ে থাকেন না কেন ?

—সে ভাই জানি নে। কেউ জানে না। কতকাল ধরে দেখচি বুড়ো একাই এখানে আছে। তবে কি জান—পরের খবর রাখি কখন, বলে নিজেই মরতে সময় পাই নে।

অনেক রাতে পাঁচালী-শেষ হল। ননীবালা ছেলের সঙ্গে বাড়ি ফিরে আসচে—দেখলে বুড়ো খোঁড়াতে খোঁড়াতে আগে আগে চলেচে। তারা সামনে আসতেই তিনি জিগ্যেস করলেন—কে যায় ? চিনতে পারলুম না তো ?

সুরেশ পরিচয় দিল। বৃদ্ধ চাটুয্যে মশায় খুব খুশী। সুরেশকে আশীর্বাদ করে ননীবালাকে বললেন—তোমাকে সেই বিয়ের বৌ-ভাতের সময় একবার মাত্র দেখেচি বৌমা। একা আছি—মাঝে মাঝে আমার ওখানে বেড়াতে যেও। কালই বরং এসো।

ননীবালা পরদিনই সেখানে গেল। পুরোনো বাড়ি, সামনে

বারান্দা, একটা ডুমুর গাছ, লেবু গাছ, পেঁপে গাছে ফল ধরেচে।

বৃদ্ধ বললেন—কি দেখছ, বৌমা? আমি নিজের হাতে সমস্ত গাছ পুঁতেচি। সবাইপুরের বিশ্বেসদের কাছ থেকে ন-বছর আগে বীজ এনেছিলুম। তখন সবাই এখানে—

—সবাই কারা, কাকা?

—তোমার খুড়ীমারা, বৌমা।

—আপনার রান্না করে কে?

—কেন, আমি নিজে? আমি পাকা রাঁধুনী, বুঝলে? এই তো এখন খানকতক পরোটা ভাজব মনে করচি।

—কাকীমা এখানে থাকেন না?

—না মা, সে বড় ছেলের কাছে কলকাতায় থাকে।

—ক-ছেলে আপনার?

—তিন জন। আমি গর্ব করচি নে, কিন্তু তারা সকলেই ভাল কাজ করে। শ্যামবাজারে তেতলা বাড়িতে থাকে, ঘরে-ঘরে ইলেকট্রিক ফ্যান। বড় ছেলের আবার মোটর গাড়ি আছে—সবাই তাকে মানে-গণে—সাপ্লাই আপিসের চাটুয্যে সাহেবের নাম করলেই সবাই চিনবে, তার চেহারাটা অব্দি সাহেবদের মতন। আমার বড় ছেলে বলে বাড়িয়ে বলচি নে।

বৃদ্ধের চোখ দুটো গৌরবে দীপ্ত হয়ে ওঠে। আপন মনেই বলেন—যখন তার জন্ম হল, তখন দেখতে এই একেবারে এতটুকু—ফুলপুরের পাঁচু ঠাকুরের দোর ধরে তার মা তাকে বাঁচায়। যখন ছ-বছরের একবার বিছে কামড়াতে একেবারে নীল হয়ে গেল—অনেক কষ্টে বাঁচানো হয়—অনেক ঝামেলার মধ্যে দিয়ে বড় করে তুলতে হয়েচে—তবেই না সে আজ 'বড়সাহেব' নৃপেন হয়েচে।···তুমি, এদিকে এসে বোস বৌমা, আমি ততক্ষণ পরোটাগুলো ভাজি।

একটা মাটির ভাঁড় থেকে তিনি আধ ছটাকের মত ঘি বের করে নিলেন। পাত্রটা দেখিয়ে বললেন—এ হল দালদা, বেশ ভাল জিনিস কি করে পাই, বল ?···ঘিয়ের সের ন-টাকা।

—কেন, আপনার ছেলে কিছু পাঠায় না ?

বৃদ্ধ বললেন—কে নৃপেন ? তার নিজের খরচা কত ! আয়ও যেমন—ব্যয়ও তো তেমনি। আমি তাকে বিরক্ত করতেও চাই নে। আমার নিজের প্রায় তিন বিঘে ধানী জমি আছে, নিজের হাতে শাক-সবজি ফলাই। পুজোতে নৃপেন আমাকে একটা দামী কাপড় পাঠিয়েছিল—তুলে রেখেচি। মাঝে মাঝে দেখি আর বলি—তাহলে সে পাঠিয়েচে ধুতিটা,···আমারই বড় ছেলে দিয়েচে। ছোট

ছেলে কলকাতায় থাকতো—এখন কানপুরে আছে, সেখান থেকে পুজোয় একজোড়া চটি পাঠিয়েচে।

ননীবালা বেলুন নিয়ে পরোটা বেলে দিচ্ছিলো।

—সরুন কাকা, আপনি পারবেন না। আমি ভেজে দিই।

—না, মা আমি নিজেই ভাজতে পারবো।

ননীবালা জোর দিয়ে বললে—আপনি সরে বসুন দিকি।

পরোটা তৈরী করা শেষ হলে সে দুধ গরম করে দিলে, পিঁড়ি পেতে বৃদ্ধকে বসবার জন্য আসন করে দিলে। তার পরে বসিয়ে তাঁকে খাওয়ালে। বৃদ্ধের মুখ দেখলেই স্পষ্ট মনে হয় যে তিনি বহু বছর এ ধরনের আদর যত্ন থেকে বঞ্চিত।

—পরোটা খুব ভাল হয়েচে। মেয়েরা না তৈরি করলে খেয়ে তৃপ্তি হয় না। মেয়েদের হাতের রান্নার স্বাদ আলাদা। বৌমা, ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করুন, বহুদিন পরে আজ ভাল খেলাম।

—আপনার ছেলের বৌদের এখেনে আনেন না কেন?

—তা হয় না। এই নির্জন ছন্নছাড়া জায়গায় তাদের কি থাকতে বলতে পারি? তারা সুখী হবে না। আমি নিজে গরীব হলেও—ছেলেদের বড় করে তুলেচি। তারা সব ভাল ভাল খায়-দায়। ভাল পরে। তাদের বিয়েও দিয়েছি তেমনি ঘরে। বড় ছেলের শ্বশুর মতিহারীর সিভিল সার্জেন,

মেজ বৌমার বাবা নেই, তবে তার কাকা খিদিরপুরে বড় কণ্ট্রাকটর। রায়চৌধুরী কোম্পানির নাম শুনেচ? ছোট ছেলের শ্বশুর বাঁকুড়ার হাকিম। বড় বৌমা ম্যাট্রিক পাস। ছোট বৌমা বি-এ অব্দি পড়েচে—পরীক্ষা আর দেয় নি। সে মেমসাহেবদের মত ইংরিজি বলতে পারে—কয়েকবার শুনেচি আমি। বৃদ্ধ একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—বৌমা, তুমি না দেখলে এসব বিশ্বাস করবে না, ভাববে বুড়ো আচ্ছা গল্প ফেঁদেচে।

—তারা এখেনে একদম আসে না?

—একবার পুজোর সময় আমার বড় নাতির অন্নপ্রাশন দিতে বড় ছেলে এসেছিল। খুব ধুমধাম হয়। সে বিশ বছর আগের কথা। সেই নাতি এখন মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়চে। দুই মেয়ে ইস্কুলে পড়ে, একজন ম্যাট্রিক দিয়েচে। একবার তারা মোটরে বেড়াতে এসেছিল। মাত্র কয়েক ঘণ্টা ছিল। অনেকদিন দেখি নি বলে দেখতে চেয়েছিলাম—ছোট ছেলে তাই তার বউকে নিয়ে এসেছিল। ছোট বৌমা শুধু চা আর ডাবের জল খেলে—বললে গাঁয়ের জল খেলে নাকি ম্যালেরিয়া হয়। খুব শিক্ষিতা মেয়ে কিনা। রাত্তিরে তারা থাকলে না—বললে মশারি নেই, থাকা চলবে না। আমি নিজে একটা ছেঁড়া মশারিতে শুই,

সারা রাত মশা কামড়ায়। চোখেও ভাল দেখি নে যে সেলাই করব।

ননীবালা বললে—কাকা মশারিটা আমাকে দিন, সেলাই করে কাল নিয়ে আসব।

—বেঁচে থাক, মা। মশারির দাম এত বেড়ে গেচে যে আমি আর কিনে উঠতে পারচি নে। আচ্ছা, একটু গুড় আনতে পার—খাবার বড্ড শখ হয়েচে। খেজুর গুড় দিয়ে পরোটা খেতে খুব ভাল লাগে। বৃদ্ধের খাওয়া শেষ হল—হুঁকোটা নিয়ে টানতে লাগলেন। ননীবালা বিদায় নিয়ে চলে গেল। তার মনটা আশ্চর্য ভাবে হাল্কা হয়ে গিয়েচে।

বাড়ি এসে সুরেশকে খেতে দিল। খেয়ে উঠে সে বললে—মা চাঁদের আলোতে এসে একটু বোস না, ভারি সুন্দর জোছ্না উঠেচে।

ননীবালা সহসা প্রশ্ন করল—'ওকে' তোর মনে আছে খোকা?

—খুব। মনে আছে রোজ সকালবেলা উঠিয়ে নামতা মুখস্ত করাতেন···বলতে বলতে তার গলার স্বর ভারি হয়ে এল।

—এই ভাল হয়েচে, এই ভাল !—ননীবালা মনে মনে বললে। তুমি নেই বলেই আমার ছেলে তোমায় মনে করে রেখেচে—সারাজীবন ধরে তোমার স্মৃতি তার কাছে পবিত্র হয়ে থাকবে।···মানুষ বদলায়—কে জানে, হয়তো বেঁচে থাকলে বুড়ো চাটুয্যে মশায়ের মত তোমাকেও দুঃখে পড়তে হত···তার চেয়ে তুমি সহমানে চলে গেচ সেটাই ভাল হয়েচে··· ।

গ্রন্থ-পরিচয়

'অনুসন্ধান' গ্রন্থে একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস ও তিনটি ছোট গল্প গ্রথিত হয়েছে ; সেগুলির প্রথম প্রকাশকাল ও তথ্য যথাযথ দেওয়া হল।

১। 'অনুসন্ধান' প্রথমে ঢাকার সাপ্তাহিক পত্র "সোনার বাংলা"র ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যায় সচিত্র প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যাটি সম্পাদনা করেন শ্রীনলিনীকিশোর গুহ। এই ছোট উপন্যাসটি প্রথমে একটি বড় উপন্যাসের পরিকল্পনায় রচিত হয়। এই উপন্যাসের নায়ক নারাণ মাস্টারের ছায়া গ্রন্থকারের একটি উপন্যাস 'অনুবর্তনে' (প্রথম প্রকাশ ১৩৪৯) পাওয়া যাবে।

২। 'টান' প্রথমে "আনন্দবাজার পত্রিকা"র ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যায় সচিত্র প্রকাশিত হয়। এই গল্পটিতে একটি অতিপ্রাকৃত ঘটনার উল্লেখ গ্রন্থকার করেছেন। এরূপ সংঘটন গ্রন্থকার ইতিপূর্বে রচিত কয়েকটি গল্পে উল্লেখ করেছেন।

৩। 'চ্যালারাম' গল্পটি 'মৌচাকে'র কার্তিক ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের পূজার সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পে কাবুলের আমীর আমানুল্লার রাজত্বকালে বাচ্চা-ই-সাকোর বিদ্রোহের কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে। বিভূতিভূষণের ঐতিহাসিক অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে গল্পটি প্রাণবন্ত হয়েছে। এই গল্প প্রকাশের বহু বৎসর পরে ডক্টর সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর সুপরিচিত গ্রন্থ 'দেশে বিদেশে' ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে

প্রকাশ করেন। ডাঃ আলী প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে কাবুল বিদ্রোহের যে সকল ঘটনাপঞ্জী বিবৃত করেছেন, বিভূতিভূষণ তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে সেই সব ঘটনার উল্লেখ করে ঘটনাবলীর গুরুত্ব স্বল্প কথায় ব্যক্ত করেছেন।

৪। 'সান্ত্বনা' গল্পটি প্রধানত ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর ষষ্ঠিতম বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিতব্য 'নেহরু অভিনন্দন গ্রন্থে' প্রকাশের জন্য গ্রন্থকার রচনা করেন। রচনাটি মূল বাঙলা থেকে ইংরেজী ও হিন্দীতে অনুবাদ করে 'নেহরু অভিনন্দন' গ্রন্থের ইংরেজী ও হিন্দী সংস্করণে প্রকাশিত হয়। মূল পাণ্ডুলিপি গ্রন্থকারের জীবিতাবস্থায় হারিয়ে যায়। বর্তমান সংকলনে এই গল্পটি ইংরেজী হতে বাঙলায় অনুবাদ করেন শ্রীদেবীদাস চট্টোপাধ্যায়। এই অনূদিত বাংলা গল্পটি 'কথাসাহিত্য' কার্তিক ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

সনৎকুমার গুপ্ত